মাযহাব বুঝার সরল পথ

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া নুমানী

GET IT ON Google Play
www.islamijindegi.com
Download on the App Store

পূর্বকথা

(মূল লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া নুমানীর ভূমিকা অবলম্বনে)

আমরা সবাই জানি, বিগত কয়েক দশক যাবৎ সরলমনা সাধারণ মানুষ, যারা ধর্মীয় জ্ঞানে অনগ্রসর, তাদেরকে তাকলীদ ও মাযহাব ত্যাগ করে 'লা-মাযহাবী' পন্থায় কোরআন-হাদীস অনুসরণের জোরদার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যা মুসলমানদের মাঝে নতুন একটা ফেতনা ও বিশৃংখলার জন্ম দিয়েছে এবং ক্রমেই তা পারস্পরিক অনাস্থা-অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে চরম ধর্ম-সামাজিক অরাজকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে! গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায়-মহল্লায়, এমনকি মসজিদে মসজিদে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠছে। একপেশে মনোভাবের কিছু লোক এই বলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, 'মাযহাব মানা হারাম বরং শিরক! মাযহাবের অনুসারী সকল মুসলমান বিদআতী, কাফের ও মুশরিক!'

দ্বীনী দাওয়াত ও ইলমী বিতর্কের আদব-কায়দার তোয়াক্কা না করে বিদ্বেষপূর্ণ একপেশে বক্তব্য সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ, লিফলেটবাজি, টেলিভিশন প্রোগ্রাম, ইন্টারনেট আপলোডিং ইত্যাদি কারণে মুসলিম সমাজে আন্তরিকতাপূর্ণ সহ-অবস্থানের পরিবর্তে সর্বত্র ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে এবং এমন একটি অল্পবিদ্য সংক্ষুব্ধ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটছে, যারা উগ্র এবং অসহিষ্ণু। যারা আগের-পরের দেশের-বিদেশের অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ ও আলেম-উলামাকে পথভ্রষ্ট, বিদআতী এমনকি কাফের-মুশরিক বলতে মোটেও দ্বিধা করে না। পূর্বসূরীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং মুসলিম সমাজের অংশ হয়েও অধিকাংশ মুসলিমের প্রতি কল্যাণকামিতার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক কর্মধারা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ অবলম্বন করে দিন দিন যারা প্রাচীনকালের খারেজী সম্প্রদায়ের রূপ পরিগ্রহ করছে। বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান হাজার বছর ধরে যে চার ধারার আলেমগণের সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যানীতি

(মাযহাব) মোতাবেক কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করে আসছে, সেই চার মাযহাবকে অন্যায়ভাবে সম্পূর্ণ বাতিল আখ্যা দেয়ার কারণে ক্রমেই মুসলিম সমাজ এক ভীষণ অন্তর্ঘাতী সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যা মুসলিম-বিশ্বের জন্য ভয়ংকর এক অশনি সংকেত। এ জন্য আলেম-উলামা তো বটেই, প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবক শ্রেণীর সাধারণ মানুষও অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত।

এমতাবস্থায় মাযহাব-প্রসঙ্গসহ এ-জাতীয় চিরাচরিত বিষয়সমুহ যাতে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে এবং বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারে তার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। তাহলে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, যাদের নিয়ত ভালো এবং যারা ইনসাফ পসন্দ করে, তারা ইনশাআল্লাহ বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে যাবে। মাযহাব-প্রসঙ্গে বক্ষমাণ পুস্তিকা একটি সহজ-সরল উপাস্থাপনা। আশা করি এটি সাধারণ পাঠকের উপকারে আসবে।

মূল কিতাব হলো ভারতের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী রহ.-এর দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া নুমানীর একটি ওজস্বী কিতাব ‘ তাকলীদ আওর মাযহাবী এখতেলাফ কী হাকীকত’ (মাযহাব ও ইমামগণের ইখতিলাফের মূল রহস্য)-এর সারসংক্ষেপ। মাওলানা নিজেই নিজের এই কিতাবের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেছেন এবং নাম দিয়েছেন ‘ তাকলীদ পর গওর কারনে কা সীধা রা-স্তাহ’ (মাযহাব বুঝার সরল পথ)। উভয় কিতাব সকলের সংগ্রহে রাখার মতো। প্রথমোক্ত কিতাবে চারটি মৌলিক বিষয় দালিলিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে,

১. মহামতি ইমামগণের ইখতেলাফের (মতপার্থক্যের) যৌক্তিক কারণসমূহের একটি কারণ কোরআন-হাদীস নিজেই। অর্থাৎ কোরআন-হাদীসের দলিলের মাঝেই একাধিক মতের অবকাশ নিহিত। ফলে ঐ একাধিক মতের একটিকে হক বলে অন্যটিকে

বাতিল আখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই। বরং শুধু এতটুকু যে, বিভিন্ন বিবেচনায় একটি কারো কাছে প্রাধান্যযোগ্য, আরেকজনের কাছে অন্যটি। সুতরাং এ জাতীয় ক্ষেত্রে নিজের মতকেই শুধু সঠিক বলা এবং অন্যমতকে সম্পূর্ণ ভুল আখ্যায়িত করা অন্ধ আবেগ আর মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

২. ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব মানাই (দলিল-নির্ভর মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলায় নির্দিষ্ট ইমামের ব্যাখ্যা মেনে চলাই) দ্বীনের উপর আমল করার স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৩. উপরোক্ত কারণে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবিশ্ব বিশেষ বিশেষ মাযহাবের ব্যাখ্যা মোতাবেক কোরআন-সুন্নাহের উপর আমল করে আসছে।

৪. উম্মতের গ্রহণযোগ্য প্রায় সমস্ত আলেম ও মুহাদ্দিস চার মাযহাবের কোনো না কোনো মাযহাব মোতাবেক দ্বীনের উপর আমল করে গেছেন।

স্নেহের পুত্র মৌলবি মাহমুদ হাসান মাসরুরের ইলমী-আমলী তরক্কীর জন্য সবার কাছে দোয়া চাই। আমার মনে হয়, তার সম্প্রসারিত ভাব-অনুবাদ মূল পুস্তিকার চেও সহজবোধ্য হয়েছে। পুস্তিকার শেষে সম্পাদকের তরফ থেকে একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। মাকতাবাতুল আযহার থেকে পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রচারিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন, আমীন।

শিক্ষা ও সমাজ-সেবামূলক দ্বীনী সংগঠন 'আসহাবুস সুফফা বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই জাতীয় কল্যাণমুখী বই-পুস্তক তৈরি ও প্রচারের ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সকলের সুপরামর্শ ও সহযোগিতা কাম্য। কেউ ছেপে

বিনামূল্যে বিতরণ করতে চাইলে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো। আল্লাহ তাআলা সকলের সহায় হোন। আমীন ।

বিনীত

আবু সাবের আব্দুল্লাহ

(পুনর্লিখিত) ১৮/৪/২০১৬ ঈ.

প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

আমরা জানি, মাযহাব মানার প্রসঙ্গ আজ অনেকের সামনে অত্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বুঝের স্বল্পতা ও দ্বীনী ইলমে অপরিপক্কতার কারণে অনেক লোক বিশেষত এক শ্রেণীর যুবক ভাই মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা নামাযসহ দ্বীনের অন্যান্য আমল কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আদায় করবেন, এ নিয়ে দারুণ অস্বস্তিতে আছেন। একদিকে মাযহাব ত্যাগের দাওয়াত, অন্যদিকে দেশের সকল আলেম-উলামা মাযহাবের অনুসারী। সাধারণ মানুষকে তারা তদোনুসারেই সালাত-সিয়াম শেখাচ্ছেন। এ-অঞ্চলের পরিবেশও হানাফী মাযহাব মোতাবেক আমলের পরিবেশ। অথচ বলা হচ্ছে,

১. তোমরা যেভাবে নামায পড়, দ্বীনের অন্যান্য আমলগুলো যে তরিকায় আদায় কর, তা হাদীস-সম্মত নয়।

২. তোমরা যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান এনেছো, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মান না কেন? মাযহাব কেন মান? ইমামের তাকলীদ কেন কর?

৩. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের তরিকা না মেনে ইমামদের মাযহাবের এত্তেবা/তাকলীদ (অনুসরণ) করে শিরকে লিপ্ত।

৪. বোখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাব বিদ্যমান। কিন্তু তোমাদের আলেমরা ঐগুলো ছেড়ে ফিকহের অনুসরণ করছে এবং তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। যদি তোমরা সহীহ দ্বীনের উপর আসতে চাও, মুক্তির পথে চলতে চাও, তবে সব ফিকহ, মাযহাব ও ইমামের এত্তেবা ছেড়ে সরাসরি কোরআন-হাদীসের অনুসরণ করো।

এমতাবস্থায় যারা সাধাসিধা মুসলমান, দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে যাদের অবগতি দুঃখজনকভাবে দুর্বল, অনেক ক্ষেত্রে যারা নামাযটাও ঠিক মতো আদায় করতে পারে না, এমন সাধারণ মানুষ ও যুবসমাজ মারাত্মক অনাস্থা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়ে। কাকে বিশ্বাস করবে, কার কথা শুনবে, দ্বীন ও শরীয়তের উপর নিশ্চিন্তে কিভাবে আমল করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

ফলে শুরু হয় বাক-বিত-া, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের তুফান! একে অপরকে গোমরাহ আখ্যায়িত করার কদর্য মহড়া। শান্তিপূর্ণ সামাজিক সহ-অবস্থানের পরিবর্তে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা-শত্রুতার ক্লেদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। একান্ত নিরীহ শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিরাও এই কাদা ছোঁড়াছুড়ি থেকে নিস্তার পায় না। ফলে আজ উম্মতের মাঝে বিভেদ-অনৈক্য মহামারি আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। অনাস্থা-অস্থিরতার কারণে মানুষের ঈমান-আমল সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং এখন প্রত্যেক মানুষকে সরলভাবে মাযহাব-প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। তাহলে তাদের অন্তরের অস্থিরতা দূর হবে। দ্বীনের উপর কিভাবে আমল করতে হবে তারা নিজেরাই তা উপলব্ধি করতে পারবে। বিভেদ-বিসম্বাদ ও অধার্মিকতার এ যুগে আত্ম-সংশোধন এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈমান ও তাক্বওয়ার যিন্দেগী গঠন করত দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।

জরুরি জ্ঞাতব্য

দ্বিমতপূর্ণ দ্বীনি মাসআলার ক্ষেত্রে দল পাকানোর চিন্তা কিংবা অন্যায় পক্ষপাতিত্বের মানসিকতা পরিহার করে চলা একান্ত আবশ্যক। কারণ আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য এবং ইসলামের প্রতি

কল্যাণ কামনা। অতএব আমরা কেবল সেই মত ও পথ অবলম্বন করবো, যাতে ঈমান-ইসলাম ও মুসলিমের কল্যাণ নিহিত।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মানুষ যদি প্রথমে একটি মত গ্রহণ করে নেয় এবং তার পক্ষে ওকালতি-প্রচারণা শুরু করে দেয়, তাহলে সে আর ঐ মতের ক্ষেত্রে মুক্তমনে, ইনসাফের সাথে এবং সত্যান্বেষী হয়ে কোনো কিছু ভাবতে পারে না। তার অবস্থা হয়ে যায় আমাদের কালের গড়পড়তা উকিলদের মতো। যারা সত্য-মিথ্যা যাই হোক নিজের দাবী প্রমাণে এটা সেটা জোড়াতালি দিতেই থাকে। সত্যকে কখনোই মাথা পেতে নেয় না। তাদের লক্ষ্য সত্য নয়, কোনোভাবে মামলা জিতে নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। ঠিক তেমনি, আলোচ্য ব্যক্তি যদি তার মতের বিপক্ষে কোনো কথা শোনে, কোনো বই পড়ে, তবে এ নিয়তে শোনে ও পড়ে যে, এগুলোর জবাব দিতে হবে। এদিক সেদিকের কথা বলে হলেও এগুলো নাকচ করে দিতে হবে। এর ফলে ধীরে ধীরে লোকটি সত্য ও ন্যায্য কথা অনুধাবনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

তাই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবো, এ-জাতীয় ভুল যেন আমাদের থেকে না হয়। আমরা খুবই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে, নেতিবাচক আবেগ ঝেড়ে ফেলে এই পুস্তিকা পড়বো। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ কামনাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য।

মূল আলোচনা

প্রথমে মনে রাখতে হবে, তাকলীদ এবং মাযহাবগত বিভিন্নতার মাসআলা মূলত একটি শাস্ত্রীয় মাসআলা। আমি 'তাকলীদ আওর মাযহাবী এখতেলাফ কী হাকীকত'-(মাযহাব ও ইমামগণের এখতেলাফের মূল রহস্য)-নামক কিতাবে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়ভাবে তফসিলি আলোচনা করেছি। কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের যথার্থ ও সরল পদ্ধতি হলো কোনো ইমামের তাকলীদ এ-বিষয়ে

দলিলসমৃদ্ধ বিস্তৃত আলোচনা ঐ কিতাবে রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' -এর (কোরআন-সুন্নাহ ও জামাআতে সাহাবার সমন্বিত মত ও পথের অনুসারী) সকল আলেম কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণের জন্য মাযহাব (বিশেষ ব্যাক্ষানীতি) মানার এই পদ্ধতি সমর্থন করেছেন, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা বিবেচনা করে এই পুস্তিকায় শাস্ত্রীয় আলোচনা পরিহার করা হয়েছে। এখানে অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাযহাব মানার অর্থ

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বাদ দিয়ে কোনো ইমামের এত্তেবা করার নাম মাযহাব বা তাকলীদ নয়। ইমামের ব্যাখ্যা কোরআন-হাদীসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও তা মানতে হবে, এমন কথা কেউ বলে না। সুতরাং যারা বলে মাযহাব মানার অর্থ 'আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করা' এটা মিথ্যা অপবাদ আর প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

মাযহাব মানার অর্থ হলো, যে সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের দলিল অকাট্ট বা সুস্পষ্ট নয়, কিংবা দলিলগুলো পরস্পর বিরোধী বলে অনুমিত হয়, অথবা কোনো বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে উম্মতের আলেমগণের মাঝে একাধিক মত চলে আসছে, এমন ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষ নিজে নিজে অধিক সহীহ ও উত্তম মত নির্ণয় করতে অক্ষম হওয়ার কারণে বরেণ্য কোনো ইমামের বিশ্লেষণের উপর আস্থা রেখে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর আমল করবে। এর নামই মাযহাব মানা বা তাকলীদ করা।

সুতরাং তাকলীদ মানে হলো শরীয়তের বিশেষ শ্রেণীর (ইজতেহাদী/ ইখতেলাফী) মাসআলার ক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃত

ইমামের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করা।

শরীয়তের বিশেষ শ্রেণীর মাসআলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কেন একজন আলেমের তাকলীদ করে এবং কেন তারা নিজেরা দলিল বিশ্লেষণ করে সরাসরি কোরআন-হাদীসের উপর আমল করতে পারে না, তাও বুঝার বিষয়।

শরীয়তের বিধানাবলি দুই প্রকার

১. কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশনা এতো পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ তা বুঝে নিতে সক্ষম। ঐ মাসআলাগুলোর দলিলে বাহ্যিক কোনো বিরোধও নেই। ফলে উম্মতের আলেমগণের মাঝে এ-সমস্ত মাসআলা নিয়ে বিশেষ কোনো মতপার্থক্যও নেই। (যেমন ঈমানের মূল বিষয় তাওহীদ-রেসালাত-আখেরাত, মূল ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত-রোযা, হজ্ব-কুরবানী, যিকির-দোয়া, মূল আখলাক শোকর-সবর, তাকওয়া-তাহারাত, সততা-চারিত্রিক শুদ্ধতা ইত্যাদি) এ-জাতীয় মাসআলাগুলো দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক অংশ। এজন্য তাতে মতপার্থক্যের সুযোগই রাখা হয়নি। আর এ সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলীদ হয় না। সচরাচর দরকারও পড়ে না। প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তার রাসুলের বাণী থেকে সরাসরি তা উপলব্ধি করতে পারে।

২. কিন্তু কিছু বিধান এমন, যার দলিলে আল্লাহ ও তার রাসুল একাধিক সম্ভাবনার অবকাশ রেখে দিয়েছেন (বা হাদীস সহীহ না যঈফ তা নির্ণয়ে দ্বিমত হয়ে গেছে)। অথবা দলিলগুলোর মাঝে বাহ্যিকভাবে বিরোধ-বিভিন্নতা ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, এমন মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণের মতামতও ভিন্নতর হয়ে গেছে। কিন্তু এ জাতীয় মাসআলা দ্বীন ও শরীয়তের বুনিয়াদি অংশ নয়। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ

সমস্ত মাসআলায় ঐক্যমতে পৌঁছা সম্ভব হয়নি, অভিন্ন মতে পৌঁছার প্রয়োজনও হয়নি। বরং আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্নতাই শরীয়তের কাম্য!

তো এই দ্বিতীয় প্রকারের মাসআলার ক্ষেত্রে দলিল যেহেতু একাধিক সম্ভাবনাময় এবং একই কারণে আলেমগণের মাঝে মত-পার্থক্যও আছে, সুতরাং কোরআন-হাদীসের রুচি-প্রকৃতি, গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে যারা অনবহিত, তারা এ জাতীয় মাসআলায় কিভাবে আমল করবে? কিভাবে তারা কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করবে? কিভাবে কোন্ সম্ভাবনা প্রাধান্য দিবে? যারা আয়-রোজগারের কাজে ব্যস্ত, পার্থিব বিষয়ে অগ্রসর হলেও ধর্মীয় জ্ঞান যাদের অপ্রতুল, প্রতি মুহূর্তের মাসআলা সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্ভাবন করার সামর্থ্য কি তাদের আছে? তাদের জন্য তো স্বাভাবিকভাবে এটুকুই সম্ভব যে, কোনো একজন স্বীকৃত ইমামের জ্ঞান-গভীরতা ও তাকওয়া-পরহেযগারির উপর আস্থা রেখে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মেনে কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করবে।

আপনি ভেবে দেখুন, অধিকাংশ মুসলমান আরবি ভাষাটাও জানে না, কেউ কেউ আরবি ভাষা কোনো মতে জানলেও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করেনি, (বা এর জন্য জীবন উৎসর্গ করেনি এবং প্রাজ্ঞ আলেম হিসাবে আলেম-সমাজের স্বীকৃতি পায়নি)। সুতরাং তাদের জন্য ইখতেলাফী (মতপার্থক্যপূর্ণ) মাসআলার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম মানার পথ একটাই কোনো স্বীকৃত ইমামের উপর আস্থা রেখে তাঁর মত মেনে নেওয়া, তাছাড়া দোসরা কোনো পথ নেই। আর এর নামই মাযহাব। এটাই হলো তাকলীদ।

এই সোজাসাপটা বিষয় নিয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং বলে বেড়ায় 'আমরা শুধু কোরআন-হাদীস মানি, মাযহাব মানি না। মাযহাব মানলে কোরআন-হাদীস মানা হয় না' তারা আসলে মাযহাব মানা এবং তাকলীদ করার সরল অর্থটা বুঝে না। অথবা তারা

পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা লালনকারী এবং উম্মতের মাঝে বিভেদকামী।

যাইহোক, 'ইমাম মানবে না কোরআন-হাদীস মানবে' মাসআলা মূলত এটা নয়। একজন মুসলমান তো কোরআন-সুন্নাহরই অনুসরণ করবে। কিন্তু যেখানে আমি সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ থেকে শরঈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অক্ষম, সেখানে আমি কী করবো? আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এমন ব্যক্তিকে কী করতে হুকুম করেছেন, সাহাবায়ে কেরামই বা কী করতেন?

মূলত হানাফী-শাফেঈরা তো বটেই, যারা কোনো মাযহাব মানে না বলে দাবী করে, তারাও বিন্তু এমন ক্ষেত্রে তাদের কাছে যিনি নির্ভরযোগ্য, এমন কোনো আলেমের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শরীয়তের উপর আমল করে থাকে। আর এটাই তাকলীদ, এর নামই মাযহাব মানা ও ইমামের ইত্তেবা করা! মাযহাবের অনুসারীগণ তাকলীদের এ-অর্থই গ্রহণ করে থাকেন। কেউ-ই এ-কথা বলেন না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণীর বিপরীত হলেও ইমামের বক্তব্য মান্য করা ফরজ- ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব। বরং কোনো ইমামের বক্তব্য যদি প্রাজ্ঞ আলেমগণের দৃষ্টিতে কোরআন-হাদীসের বিপরীত প্রমাণিত ও স্বীকৃত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা হারাম। ফিকহের মূলনীতি-গ্রন্থসমূহের সবগুলোতেই এ-নীতির উল্লেখ আছে। অতএব তাকলীদ হবে শুধু সে সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে, যেখানে দলিলের আলোকে একাধিক মতের সম্ভাবনা রয়েছে, সাহাবা যুগ থেকে এ নিয়ে দ্বিমত চলে আসছে, এমনতর ক্ষেত্রে গবেষণা করে একটি মতকে প্রাধান্য দেয়ার মতো গভীর ইলম ও তাকওয়া যাদের নেই, তাদের জন্য উপরোপক্ত গুণসম্পন্ন কোনো ইমামের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমল করাই কুরআন-সুন্নাহর চিরাচরিত শ্বাশত নির্দেশ।

পূর্ববর্তীদের মাঝে দ্বিমতপূর্ণ মাসআলা দ্বীনের মূল অংশ নয়

ইখতেলাফী (মতপার্থক্যপূর্ণ) মাসআলার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এ জাতীয় মাসআলা মতৈক্যপূর্ণ মাসআলার মতো দ্বীনের বুনিয়াদি স্তরে আসে না। এজন্য ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কেউ একটি মত গ্রহণ করলে তাকে কাফের-গোমরাহ বলার ন্যূনতম অবকাশ নেই এবং সবাই একমত যে, এই মতভেদের কারণে কেউ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'-(কোরআন-সুন্নাহ ও জামাআতে সাহাবার সমন্বিত মত ও পথের অনুসরণ)-এর গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় না। সুতরাং মত দেয়ার যোগ্য হয়ে আপনি একটি মত গ্রহণ করেছেন, তিনি গ্রহণ করেছেন অন্যমত। যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করে মত দিয়েছেন বলে আপনি যেমন হকের উপর আছেন, তিনিও আছেন। কিন্তু ইলমী যোগ্যতা অর্জন ব্যতিরেকে মত দিতে উদ্যত হওয়া অনধিকারচর্চার শামিল ও গুরুতর পাপ। মুসনাদে আহমাদের ২০৬৯ নং হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোরআন সম্বন্ধে ইলম ছাড়া কথা বলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।' অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা নবীজীর হাতে এই মর্মে শপথ ও বাইআত করেছি যে...আমরা কোনো বিষয়ের যোগ্য অধিকারীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে বিবাদ করবো না...।' সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৭০৫৬। সুতরাং যারা কোরআন-সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ, তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ তো বটেই, ভিন্ন সাবজেক্টের কোনো বিশেষজ্ঞের জন্যও বিরোধে জড়ানো সুস্পষ্ট অন্যায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার রহ. (মৃত্যু:৭২৮হি.) মাযহাবপন্থী এবং মাযহাব-বিরোধী সবার নিকট সমাদৃত এক মহা মনীষী। তিনি বলেন, 'ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুজতাহিদকে (শরঈ বিষয়ে গভীর পা-িত্যের অধিকারী মুত্তাকী পরহেযগার আলেম, যিনি দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা উদ্ভাবন ও মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দানে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে)-তার মত অনুযায়ী আমল করতে দেয়া হবে। এটা হলো সাহাবাগণের

সর্বসম্মত আমল। যেমন ইবাদতের বিভিন্ন শাখাগত মাসআলা, তেমনি বিবাহ-তালাক, হেবা-রাজনীতি ইত্যাদির শাখাগত বিষয়। আর সাহাবাগণের ব্যাপারে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তারা কখনো কোনো বাতিল বা গোমরাহির উপর একমত হবেন না এবং কোরআন-সুন্নাহয় তাদের ইত্তেবা করার আদেশ রয়েছে।’ (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ১৯/১২২)

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর উক্ত বক্তব্যের মতলব হলো, সাহাবায়ে কেরাম একমত যে, ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুজতাহিদ ও তাঁর অনুসারীকে তাঁদের রায় মোতাবেক আমল করতে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে তাঁরা একমত ছিলেন। আর সাহাবাগণ কোনো বিষয়ের উপর একমত হলে তা ভুল হতে পারে না। সুতরাং তাঁরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন (অর্থাৎ ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলকে তাদের মত অনুসারে আমল করতে দেওয়া হবে, কাউকে গোমরাহ বলা যাবে না) এটা সহীহ আর এই সহীহ বিষয়ের অনুসরণও জরুরি। কারণ কোরআন-হাদীসে সাহাবীগণের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেমতে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে মাসআলা দ্বিমতপূর্ণ, সে মাসআলার ক্ষেত্রে একটি মত গ্রহণ করে অন্য সাহাবীর মতের অনুসারীদেরকে যারা হাদীস বিরোধী, গোমরাহ ইত্যাদি বলছে, তারা সাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে উম্মতের মাঝে ফেতনা ছড়াচ্ছে। আর যারা সকল সাহাবী, স্বীকৃত মুজতাহিদ ইমাম ও তাদের অনুসারীদের মতের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করে, তারা সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

দ্বীনী ইলমে অনগ্রসরদের জন্য তাকলীদ অনস্বীকার্য

এতক্ষণে আপনি হয়ত বুঝতে পেরেছেন, কোআন-সুন্নাহর অনুসরণের জন্য সাধারণ মানুষের উপর কোনো ইমামের মাযহাব ও সুশৃঙ্খল ব্যাক্ষানীতি মেনে চলা জরুরি। তাদের জন্য ইখতেলাফি

মাসআলার ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুসরণের এই একটিমাত্র নিরাপদ পথ খোলা আছে। এ ছাড়া দোসরা কোনো পথ নেই।

‘সাধারণ মানুষের পক্ষে সরাসরি কোরআন-হাদীস ঘেঁটে আমল করা অসম্ভব’ এমন কথাকে কেউ কউ জাহেলি যুগের কথা মনে করেন। তাঁদের ধারণা, আমাদের যুগের তুলনায় আগের যুগ হলো জাহেলী যুগ। কেননা আগের তুলনায় এখন ইলম অনেক বেশি। এই কথা ইহলৌকিক বিদ্যার ক্ষেত্রে চলে। কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল। কেননা সহীহ বোখারীর, ২৬৫২ নং হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলম ও আমলে শ্রেষ্ঠ যুগের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে ঘোষণা করেন, ‘শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ (অর্থাৎ যারা আমাকে পেয়েছে এমন সাহাবীর যুগ)। এরপর তাদেরকে (সাহাবীরদেরকে) যারা পাবে তাদের (তাবিঈর) যুগ। এরপর যারা এদের পর আসবে তাদের (তাবে-তাবেঈর) যুগ ।’

সুতরাং যারা বলে, আগের লোকেরা কে কী বললো তার প্রতি গুরুত্ত দেয়ার দরকার নেই, আমরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কোরআন-হাদীস ঘেঁটে নিজেদের পথ তৈরি করে নিতে পারবো। কারণ এখন সাধারণ মানুষও দ্বীন বুঝে! আগের লোকজনের চেও বেশি বুঝে! যাঁরা এমন ধারণা করে তাঁরা আসলে বোকার স্বর্গে বাস করেন। ধর্মীয় বিদ্যার জগত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুবই সামান্য। ফলে তাঁরা দুই চারটি চটি বই পড়েই নিজেকে অতি সাধারণ মানুষের স্তর থেকে মুজতাহিদ-স্তরে উঠে গেছেন বলে ভাবতে শুরু করেন এবং ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে নিজেকে সিদ্ধান্ত দেওয়ার যোগ্য ভেবে অনায়াসে মাযহাব পরিত্যাগের মতো হাস্যকর কা-করে বসেন। অথচ তাঁর খবরই নেই যে, আলেমগণ এক এক মাসআলার দলিলের উপর বড় বড় কিতাব লিখে গেছেন। এগুলো বোঝার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে অভিজ্ঞ আলেমের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রে দীর্ঘ পড়াশোনা করা একান্ত আবশ্যক। সাধারণ মানুষ তো

দূরের কথা, আজকালের সাধারণ আলেমগণের শতকরা দু'চার জনের পক্ষেও ঐ কিতাবসমুহ পড়ে বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এমতাবস্থায় যদি তাকলীদ করা হারাম বলা হয়, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানকেই এক একটি মাসআলায় সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য জীবনপাত করতে হবে! কারো পক্ষেই আর ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেতখামার কিছুই করা সম্ভব হবে না। ১৫-২০ বছর লেগে যাবে প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করতে করতে। এরপর এক এক মাসআলায় সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য পড়তে হবে শত কিতাব...!!

এবার বলুন, আমরা যারা সাধারণ মুসলমান, আমাদের জন্য কি তা সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তবে তাকলীদ করা ছাড়া কোনো গতি কি আছে? সাহাবীগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছিলেন দ্বীনী ইলমে প্রাজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ। দিন-রাত তারা শুধু ইলম চর্চা করতেন। ইলম-চর্চার পিছনে জীবনের সবটুকু সময় ব্যায় করতেন। অন্যরা ঐ পরিমাণ সময় বের করতে পারতেন না, ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, ক্ষেতখামারে কাজ করতেন আর প্রথমোক্তদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে তাদের মাযহাব ও ব্যাখ্যা মতো কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করে যেতেন। এটাইতো স্বাভাবিক নিয়ম!

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী (মুত্যু: ৪৬৩হি.) রহ. লিখেছেন, 'ইজতেহাদী (একাধিক মতের সম্ভাবনাময়) মাসআলা সেগুলো, যেগুলোতে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য দলিল-বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে। যেমন ইবাদত, লেনদেন, বিবাহশাদি ইত্যাদির শাখাগত মাসআলা। এ সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলীদ অনুমোদিত। দলিল হলো, আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা নিজেরা না জানলে আলেমকে জিজ্ঞেস কর।' (সূরা নাহল ১৬/৪৩) কেননা এ-জাতীয় শাখাগত মাসআলাতেও যদি তাকলীদ করতে নিষেধ করা হয়, তবে তো সাধারণ মানুষকে পরিপূর্ণরূপে শরীয়তের ইলম অর্জনে মশগুল হতে হবে এবং বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

(আর এর জন্য তো পুরো যিন্দেগী ওয়াকফ করে দিতে হয়!) তাহলে জীবন চলবে কিভাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেতখামার সব তো বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এমন আদেশ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।' (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/৪১৬)

ইজতেহাদী মাসআলা পরিচিতি

একাধিক মতের অবকাশ আছে, এমন ইজতেহাদী মাসআলা আমরা চিনবো কিভাবে? এর সুনিশ্চিত আলামত হলো, 'পূর্ববর্তী (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর) ইমামগণের মতপার্থক্য হওয়া এবং ঐ বিষয়ে পরবর্তীতেও মতৈক্যে পৌঁছতে না পারা।' এবার আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি, সব ইমামের সব দলিল সামনে আসার পরও যেহেতু ঐ আল্লাহভীরু ইমামগণ যে যার মতের উপর অটল আছেন, এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, এই মাসআলাটি ইজতেহাদী। একারণেই তো সবাই সবার ইজতিহাদ দলিলসম্মত হবার ব্যাপারে আস্বস্ত। একই কারণে কেউ কারো মতকে বাতিল বলে উড়িয়েও দিচ্ছেন না। একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করছেন না। আর এটাই হলো সাহাবায়ে কেরামের রীতি।

সুতরাং এই উম্মতের ইমামগণ উচ্চমাত্রার খোদাভীতি ও জ্ঞান-গভীরতা সত্ত্বেও যখন কোনো একটি মাসআলায় একমত হতে না পারেন, বারবার একে অপরের দলিল সামনে রেখে চিন্তা-ফিকির করার পরও হাজার বছর যাবৎ সেই মতপার্থক্য থেকেই গেছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে, আসলে এ-মাসআলায় কোরআন-হাদীস মতেই দ্বিমতের এবং দুই রকম আমলের অবকাশ আছে।

তো যার বিবেক আছে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার মতো স্থিরতা যার আছে, যে দলবাজি ও পক্ষপাত-দোষ মুক্ত, সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে, এমনক্ষেত্রে আসলে উভয় মতই কোরআন-হাদীস সিদ্ধ। কিন্তু যার ভিতর ইনসাফ নেই, যে নিতান্ত বিবেকহীন, সে তো

আরও সরল বাস্তবতাও অস্বীকার করে বসে। আল্লাহ পাক সবাইকে এমন বিবেকশূন্যতা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

হাদীস না জানা ইখতেলাফের মূল কারণ নয়

আমদের সবার একটি অভিজ্ঞতা এই যে, আমরা দেখেছি একটি পার্থিব বিষয়ে পূর্ণ অবগতি সত্ত্বেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়ই একমত হতে পারেন না। ইজতেহাদী মাসআলার ক্ষেত্রটিও অনুরূপ। চিন্তা ও বুঝের ভিন্নতার কারণে একটি মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের সকল শাখায় (কোরআন-হাদীসসহ যাবতীয় বিদ্যায়) পূর্ণ ব্যুৎপত্তি সত্ত্বেও দু' জন আলেম অনেক সময় একমত হতে পারেন না।

হতে পারে, কিছু মাসআলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস কোনো ইমামের নিকট পৌঁছেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে তো মোটামুটি সবার সব দলিল সবার সামনে এসে গেছে। কিতাব আকারে হাদীস সংকলিত হয়ে হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেক মাযহাবের অসংখ্য আলেম স্ব স্ব মাযহাবের সঙ্গে অন্য মাযহাবের তুলনা করে দলিলসমৃদ্ধ কিতাব লিখেছেন, ইখতেলাফ তবু থেকে গেছে। (কারণ একাধিক সম্ভাবনাময় দলিলসমুহ বোঝার ক্ষেত্রে দুজনের দু' মত হতেই পারে।) বোঝাগেলো, কোরআন-হাদীসেই এই ইখতেলাফের অবকাশ রয়েগেছে। এর ফলে একটি মত যেমন সবার কাছে সন্দেহতীতভাবে সহীহ প্রমাণিত হয়নি তেমনি দ্বিতীয় মতও সবার কাছে সুস্পষ্টভাবে ভুল-বাতিল প্রমাণিত হয়নি। এজন্য এক ইমাম অন্য ইমামকে বিভ্রান্তও বলেননি।

তা ছাড়া সহীহ হাদীস মানলেই ইখতেলাফ দূর হয়ে যাবে বিষয়টা এমনও নয়। কারণ একটি হাদীস গ্রহণযোগ্য সহীহ না কি অগ্রহণযোগ্য যঈফ এটা নিয়েও তো বিজ্ঞজনদের মাঝে দ্বিমত হতে পারে; দ্বিমত হওয়া বরং স্বভাবিক! এই জন্য যারা নিজেদেরকে 'সহীহ হাদীসের অনুসারী আহলে হাদীস' দাবী করে

এবং চিরায়ত মাযহাব ত্যাগ করে নিজেদের বুঝ মতো কোআন-হাদীস মানলে ইখতেলাফ দূর হয়ে যাবে মনে করে, আশ্চর্য হলো, তাদের আলেমগণকেও পরস্পরে বিভিন্ন মাসআলায় প্রচুর দ্বিমত করতে দেখা যায়!

সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম তাকলীদ করতেন

আসলে কোরআন হাদীস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করা এবং মতভেদপূর্ণ ক্ষেত্রে মত প্রদান করা অনেক উচ্চস্তরের আলেমে দ্বীনের কাজ। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক বিশিষ্ট আলেমের পক্ষেও ঐ স্তরে পৌঁছা সুকঠিন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মাযহাব ও তাকলীদ আমাদের জন্য এক অপরিহার্য বাস্তবতা। আমাদের মতোদের জন্য তাকলীদ করতে অস্বীকার করা নিছক একটা হঠকারিতা।

এজন্য আমরা দেখি, সাহাবায়ে কেরামের যুগেই তাকলীদের প্রচলন হয়েগেছে। সাধারণ সাহাবীগণ এবং সেকালের অন্যান্যরা কোনো প্রাজ্ঞ সাহাবীর কাছে মাসআলা জানতে চাইতেন, তিনি কোরআন-সুন্নাহর দলিল উল্লেখ ব্যতীত মাসআলা বলে দিতেন। একজন সাধারণ ব্যক্তি নিজে ইজতিহাদী মাসআলা এবং তার লম্বা-চওড়া দলিল বুঝবে না বলে আলেমগণের উপর আস্থা রেখে শুধু মাসআলা জেনে নিতেন, দলিল তলব করতেন না। কোরআন-সুন্নাহর দলিলসম্মত কিন্তু দলিলের উল্লেখ ব্যতিত সাহাবায়ে কেরামকর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াসমুহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। বিশেষত ইমাম আবু হানীফকৃত 'কিতাবুল আ-ছার,' ইমাম মালেককৃত 'আল-মোয়াত্তা', ইবনে আবি শায়বাকৃত 'আল-মুসান্নাফ' ইত্যাদিতে ফকীহ (শরঈ বিধিবিধান বর্ণনায় পারদর্শী) সাহাবীগণের মাযহাব ও মতামতসমূহ দলিলের উল্লেখ ছাড়াই বর্ণিত আছে।

তো দেখা যাচ্ছে, ঐ ফতোয়াসমুহের অধিকাংশের সঙ্গে দলিলের উল্লেখ নেই, যদিও বাস্তবে তা দলিলসমৃদ্ধ। প্রশ্নকারী ব্যক্তি ঐ সাহাবীর ইলমের উপর আস্থা রেখে আমল করেছেন, আমল করার জন্য দলিল তলব করে নিজে দলিল বুঝার অপেক্ষা করেননি। এটাই তো তাকলীদ!

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন হলেন আরবের একজন প্রসিদ্ধ আলেমে রব্বানী। শায়খ ইবনে বায রহ.-এর পরই যাকে সবচে বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তিনি লিখেছেন, 'বাস্তবতা হলো, সাহাবাযুগ থেকেই তাকলীদ বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং আমাদের যুগে বিরাট সংখ্যক মানুষ এমন আছে, যারা নিজেরা কোরআন-হাদীস থেকে মাসআলা আহরণ করতে সক্ষম নয়। কারণ দ্বীনী ইলমে তাদের ঐ পরিমাণ দক্ষতা নেই। সুতরাং তাদের কাজ হলো আলেমদের জিজ্ঞেস করে আমল করা। আর এটাই হলো তাকলীদ। (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দরব্ ২/২২০)

চার মাযহাব গঠনের প্রেক্ষাপট

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন পৃথিবীর বহু অঞ্চল মুসলমানদের হস্তগত হয়, দূরদারাজ এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, তখন আলেম ও ফকীহ সাহাবীগণকে সে সমস্ত এলাকার মুসলমানদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তাঁরা নবীজীর সোহবত থেকে অর্জিত বুঝ-সমঝ অনুসারে কোরআন-হাদীস ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানুষকে দ্বীন শিখিয়েছেন।

পৃথিবীর সব মানুষই আপন আপন এলাকার মনীষীদের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এটা দুনিয়াবি ক্ষেত্রে যেমন স্বাভাবিক সত্য দ্বীনী ক্ষেত্রেও তাই। ফলে প্রত্যেক এলাকার (অধিকাংশ) আলেমের চিন্তাধারা ঐ এলাকার সাহাবীগণের চিন্তাধারার আদলে গড়ে উঠেছে। এবং হিজরী প্রথম শতকেই পৃথক পৃথক ফিকহী মাযহাব

কায়েম হয়ে গেছে। যেমন তখন বলা হতো 'মদীনার (সাহাবী ও আলেমেদের) মাযহাব', 'কূফার মাযহাব,' 'মক্কার মাযহাব,' 'শামের মাযহাব' ইত্যাদি। আজ আমরা যে সমস্ত মাসআলায় ইখতেলাফ দেখতে পাই, তার অধিকাংশের মাঝে বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত সাহাবীগণেরও ভিন্ন ভিন্ন রায় ছিলো। মূলত এভাবেই আলাদা আলাদা ফিকহী ঘরানার সূচনা হয়।

সাহাবা-যুগে সুনির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ

হিজরী প্রথম শতকেই অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম জীবিত থাকতেই বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব প্রচলিত ছিলো। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. 'ইকদুল জীদ' নামক কিতাবে লিখেছেন, 'সাহাবা-যুগেই এই ইতিবাচক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, প্রত্যেক এলাকার লোকেরা তাদের এলাকার বড় আলেমের তাকলীদ করবেন এবং সে এলাকার প্রচলিত মাযহাব মেনে চলবেন।'

শরীয়া-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও তার ইতিহাস সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে, তিনি অবশ্যই এ-বিষয়টি স্বীকার করবেন। যেমন সহীহ বোখারীতে এসেছে, এক মাসআলায় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মদীনাবাসীর অনুসৃত সাহাবী যায়েদ বিন সাবেতের মাঝে দ্বিমত ছিলো। ঘটনাক্রমে মদীনার লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে ঐ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করে বসলেন। তো ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মত অনুসারে জবাব দিলেন (সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি নিজের মতের পক্ষে একটি হাদীসও বললেন।) কিন্তু মদীনাবাসী (সাহাবী এবং অন্যান্যরা) বললেন, 'আমরা যায়েদের সিদ্ধান্ত ছেড়ে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি না।' (সহীহ বোখারী, ১৭৫৮)

কারণ মদিনাবাসীর আস্থা বেশি ছিলো যায়েদ বিন সাবেতের ইলমী পাণ্ডিত্যে উপর। তারা ভাবলেন, এ বিষয়ে যায়েদ বিন সাবেতের

কাছে আরো মজবুত কোনো দলিল থাকতে পারে কিংবা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস যে হাদীস বলেছেন, যায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তার ভিন্ন কোনো সঠিক ব্যাখ্যা আছে। এজন্য ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর পেশকৃত হাদীস দেখার পরও তারা আগে নিজেদের আস্থার পাত্র যায়েদ বিন সাবেতের সঙ্গে যোগাযোগ করা আবশ্যক মনে করেছেন। (নিজেরা আরবী ভাষাভাষী এমনকি সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও মাসআলার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকে যথেষ্ট ভাবেননি। কিন্তু আমাদের কালে বহু ভাই নিয়মিত পড়াশোনা দূরের কথা আরবি ভাষাটাও জানেন না, কোরআন মাজীদ শুদ্ধ করে পড়তে জানেন না, বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ পড়েই নিজেকে হাদীসের ব্যাখ্যাতা হিসাবে উপস্থাপনের বৃথা চেষ্টা করেন এবং জটিল-জটিল মাসআলায় মত ব্যক্ত করতে কুন্ঠিত হন না। এমনকি সমকালীন-পূর্ববর্তী সকল বড় বড় বিশেষজ্ঞ আলেমের প্রতি অজ্ঞতা আরোপ করতেও লজ্জিত বোধ করেন না। আজ আমরা আমাদের আশপাশের লোকজনের এমন বেবুঝ কর্মকা-ে বড় অসহায়! আল্লাহ সবাইকে বুঝ দান করুন। আমীন।) তারা জানতেন, মাসআলার দলিলের ক্ষেত্রে হাদীসের মাঝে বিভিন্নতা প্রায়ই দেখা যায়। হাদীস বুঝার ক্ষেত্রেও আলেমগণের মাঝে ইখতেলাফ হয়। সুতরাং তারা শৃঙ্খলাগত কারণে আগে যায়েদ বিন সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন এবং ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসটি পেশ করলেন। অতপর যাচাই-বাছায়ের পর ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতই সঠিক প্রমাণিত হলো। তখন তিনি ও তাঁর অনুসারী মদীনাবাসী পূর্বের রায় প্রত্যাহার করে নিলেন।

তো বুঝা গেলো, মদিনাবাসী যায়েদ বিন সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর আস্থা রেখে তাঁর মত অনুসারে কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করতেন। অন্য কোনো মত ও দলিল সামনে আসলে তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত না নিয়ে যায়েদ বিন সাবেতের সামনে পেশ করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। এজন্যই তারা আব্দুল্লাহ

ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, ‘আমরা যায়েদের সিদ্ধান্ত ছেড়ে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি না।’ অর্থাৎ তারা কোরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে কেবল যায়েদ বিন সাবেতের তাকলীদ করতেন। কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার ক্ষেত্রে একমাত্র যায়েদ বিন সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর মাযহাব অনুসরণ করতেন।

হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত এ-জাতীয় অসংখ্য ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, পৃথক পৃথক মাযহাব ও তার অনুসরণ সাহাবাযুগেই বিদ্যমান ছিলো, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং মাযহাব-বিরোধী ভাইদের প্রতি অনুরোধ, আল্লাহর ওয়াস্তে সাধারণ মানুষকে এই বলে বিভ্রান্ত করবেন না যে, পৃথক পৃথক মাযহাবের অনুসরণ করা বিদআত কিংবা শিরক। কারণ তা সাহাবা, তাবেঈ (ঈমানের সাথে যারা সাহাবীকে দেখেছেন) এবং তাবে-তাবেঈর যুগে ছিলো না, পরে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রিয় পাঠক। আপনি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন, মাযহাব পূর্ব থেকেই ছিলো। ছিলো না শুধু হানাফী মালেকী ইত্যাদি নাম। যেমন হাদীস আগ থেকেই ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে নাম হয়েছে বোখারী-মুসলিমের হাদীস, তিরমিযীর হাদীস ইত্যাদি। তো নামের কারণে বোখারী মুসলিমের হাদীস যেমন বিদআত হয়ে যায়নি, শুধু নামের কারণে হানাফী-মালেকী মাযহাবও বিদআত হবে না। কোনো জিনিসের বিচার তো হয় হাকীকত তথা সারবত্তা হিসাবে, নাম ও পরিভাষা হিসাবে নয়।

এখানে আরও মনে রাখতে হবে, পৃথক পৃথক মাযহাবের অনুসরণ হবে ঐ সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে, যেগুলোর দলিলের মাঝেই ভিন্ন ভিন্ন মতের অবকাশ আছে, যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু যে সমস্ত মাসআলায় কোরআন-হাদীস অকাট্ট ও সুস্পষ্ট, তাতে কোনো মতেই মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

যাইহোক, সাহাবা-যুগ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের অনুসরণ জারি হয়ে গেলো। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ (কোরআন-সুন্নাহ ও জামাআতে সাহাবার অনুসারী) সকল আলেম কোরআন-হাদীস অনুসরণের এই স্বাভাবিক পদ্ধতি গ্রহণ করে নিলেন। খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (মৃত্যু:১০১হি.) রহ. এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি খলিফা হওয়ার আগে যখন মদিনার বিচারক ছিলেন, তখন মদিনার মাযহাব অনুসারে রায় দিতেন। আবার যখন শাম এলাকায় গমন করতেন, তখন তিনি তথাকার প্রচলিত মাযহাব অনুসারে বিচার করতেন। (সুনানে দারেমীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত আছে, ইমাম হুমাইদ রহ. একবার খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (মৃত্যু:১০১হি.) রহ.-এর নিকট গিয়ে বললেন, 'এই যে ভিন্ন ভিন্ন মত চলে আসছে, এটা খতম করে একটি মাত্র ভিত্তির উপর সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা উচিৎ। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. বললেন, 'এটা আমার পছন্দ নয় যে, ফিকহী মাসআলায় মতপার্থক্য হবেই না।' তিনি খেলাফতের সকল অঞ্চলে সরকারী ফরমান লিখে পাঠালেন, 'প্রত্যেক এলাকার লোকেরা যেন তাদের এলাকার আলেম ও ফকীহদের মত অনুসারে ফায়সালা করে।' (সুনানে দারেমী, হাদীস নং ৬৫২)

বাহ্যত বিশ্বের সকল মুসলমান সব বিষয়ে একমত হয়ে যাবে এর চে বড় সুচিন্তা আর কী হতে পারে! কিন্তু যারা শরঈ দলিলের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তারা জানেন এটা হবার নয়। এটা বরং আল্লাহপাকের করুণা-গুণের খেলাফ। কারণ শাখাগত বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক মতপার্থক্য কোনো বিরোধ-বিসম্বাদ নয়; বরং তা সুন্নাহর বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য। এর ফলে আমলের ক্ষেত্রে সহজতা সৃষ্টি হয়।

একবার আব্বাসী খলিফা মানসূর ইমাম মালেক (মৃত্যু:১৭৯হি.) রহ.-এর নিকট দরখাস্ত করলেন, আমরা আপনার কিতাব ‘মোয়াত্তা’ (যা সহীহ বোখারী ও মুসলিমের উৎসগ্রন্থ) মুসলিম-বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিই এবং সব মাযহাব ত্যাগ করে আপনার কিতাবে উল্লিখিত মাযহাব মোতাবেক আমল করার ফরমান জারি করি। ইমাম মালেক রহ. বললেন, ‘না না, এমনটা করতে যাবেন না। বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছে বিভিন্ন মাযহাব পৌঁছে গেছে। তাদের কাছে তাদের মতের পক্ষে হাদীসও পৌঁছেছে। আর মানুষকে তাদের আমল থেকে সরতে বলা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং যে এলাকার লোকেরা নিজেদের জন্য যে মাযহাব পছন্দ করে নিয়েছে, তাদেরকে তার উপরই থাকতে দিন।’

ইমাম মালেক (মৃত্যু:১৭৯হি.) রহ. আরো বলেছিলেন, ‘মারাকিশ-আন্দালুস (আফ্রিকা-স্পেন) এলাকায় আমার মত ও মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছে। শামে (সিরিয়াতে) আছেন ইমাম আওযাঈ (মৃত্যু:১৫৭হি.) রহ.। আর ইরাকের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।’ (তারতীবুল মাদারিক ২/৭২)

ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, তাঁর সময়ে (১৭৯ হিজরির আগ থেকে) একেক এলাকায় একেক মাযহাব প্রচলিত ছিলো। সিরিয়াবাসী ইমাম আওযাঈ রহ.-এর তাকলীদ করতেন। স্পেনের আন্দালুসে ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাব অনুসৃত হতো। ইরাকের অধিবাসীগণ হানাফী মাযহাব মেনে চলতেন। আর উম্মতের সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, কোনো এলাকার লোকদেরকে তাদের এলাকার আলেমদের কোরআন-সুন্নাহসম্মত মাযহাব অনুসরণে বাধা দেওয়া এবং প্রচলিত মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মত গ্রহণের দাওয়াত দেয়া যাবে না।

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই আলাদা আলাদা মাযহাব গঠন-পক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। প্রত্যেক এলাকার লোকেরা সাধারণত তাদের এলাকার আলেম-উলামার মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং এ বিষয়টি সকল সাহাবা-তাবেঈ অনুমোদন করতেন। এমনকি একজন মুজতাহিদ আলেমও আপন এলাকায় প্রচলিত আমলের বিপরীত কোনো মত সাধারণত প্রকাশ করতেন না, ঐ মতের প্রতি দাওয়াত দিতেন না। কেননা প্রচলিত আমলটি ভুল প্রমাণিত হয়নি, বরং তাও সুন্নাহসম্মত। দলিলের আলোকে উভয় মতের সম্ভাবনাই রয়েছে। সুতরাং নতুন ভিন্নমত প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। (ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্য থেকে পাঠক বিষয়টি আগেই আঁচ করতে পেরেছেন। আর আমরা নিজেরা তো এর সবচে বড় ভুক্তভোগী!)

তো এভাবে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাযহাব প্রচলিত ছিলো কিন্তু কোনোটাই গ্রন্থাকারে সংকলিত ছিলো না। সর্ব প্রথম ইমাম আবু হানিফা (মৃত্যু:১৫০হি.) ও ইমাম মালেক এবং তাদের শাগরিদগণ আপন আপন এলাকার প্রচলিত পরিমার্জিত মাযহাব কিতাব আকারে সংকলন করেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. মূলত ইরাকে প্রচলিত সাহাবায়ে কেরামের মাযহাব সংকলন করেন। যেখানে প্রায় ১৪শত সাহাবী বসবাস করতেন। আর ইমাম মালেক সংকলন করেন মদিনায় প্রচলিত মাযহাব। এরপর আসেন ইমাম শাফেঈ (মৃত্যু:২০৪হি.)। যিনি ইমাম মালেক রহ.-এর শাগরিদ এবং হেজায (মক্কা-মদিনাসহ পুরো) এলাকার প্রতিনিধি। তিনি তার এলাকার অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈর মত একত্রিত করেন। ফলে শাফেঈ মাযহাবের গোড়াপত্তন হয়। ফিকহে শাফেঈর ধারারই এক বড় ইমাম হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু:২৪১ হি.) রহ.। তিনি ইমাম শাফেঈর সঙ্গে কিছু মাসআলায় দ্বিমত করেন। এর ফলে ভিন্ন একটি মাযহাবের সূচনা হয়। প্রথম দিকে এই চারটি মাযহাবের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে চলতো লাইস ইবনে সাআদ

(মৃত্যু:১৭৫হি.) রহ.-এর মাযহাব। শামে (সিরিয়ায়) চলতো ইমাম আওযাঈ (মৃত্যু:১৫৭হি.) রহ.-এর মাযহাব। কোথাও চলতো ইমাম তাবারী (মৃত্যু:৩১০হি.)-এর মাযহাব। কিন্তু চার মাযহাব ছাড়া বাকিগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং কারো কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই আল্লাহর ইচ্ছায় চার মাযহাব ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ তাদের মাযহাবের পক্ষে দলিলের কিতাব লিখেছেন। অন্য মাযহাবের দলিল নিয়ে চিন্তা করে তুলমামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কোনো মাসআলায় যদি নিশ্চিত হতে পারতেন যে, এটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে হয়েছে, তবে সেই মাসআলায় আপন মাযহাবের মত ত্যাগ করে অন্য মাযহাব মতে ফতোয়া দিতেন। যদিও এমনটা করার প্রয়োজন খুব কমই হয়েছে। কারণ ইমামগণের মতপার্থক্য তো কোরআন-সুন্নাহর ইলম কম থাকার কারণে বা ভুল বুঝার কারণে হয়নি। বরং ইখতিলাফ হয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে কোরআন-সুন্নাহর ভিতরে ইখতিলাফের আবকাশ রেখে দেওয়ার কারণে। কিংবা ইখতিলাফ হয়েছে চিন্তার এ্যাঙ্গেলের ভিন্নতার কারণে। যেখানে উভয় এ্যাঙ্গেলই যৌক্তিক। মোটকথা এভাবেই চার মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে এবং হাজার বছর ধরে উম্মতের মাঝে অনুসৃত হয়ে আসছে।

মাযহাব চারটি কেন?

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি তাকলীদের নির্দোষ মর্মটা প্রিয় পাঠকের বুঝে এসেছে এবং হয়তো এটাও অনুভব করতে পেরেছেন যে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা ও মাযহাব মানা এক অপরিহার্য বাস্তবতা। আর এটা নতুন কিছু নয়, সাহাবায়ে কেরামই তাকলীদের সূচনা করে গেছেন।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, মাযহাব তাহলে চারটি কেন? কম-বেশও তো হতে পারতো! আসলে মাযহাবের বিভিন্নতা

সাহাবা-যুগ থেকেই ছিলো। এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাযহাব প্রচলিত ছিলো। তাই মাযহাব শুধু চারটি নয়, এই উম্মতের মাঝে বড় বড় মনীষী যেমন অনেক বিভিন্ন মাসআলায় মাযহাবও অনেক। তবে অধিকাংশ মনীষীর ঐ সকল মাযহাব সংকলিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছেনি কিংবা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আর চার ইমাম যেভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মূলনীতি ও শাখাগত মাসআলা বৃহদাকারে সংকলন করেছেন এবং তাদের অনুসারীগণ তা যাচাইবাছাই করেছেন, অন্যদের ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠেনি। ফলে অন্যান্য মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কুদরতিভাবে রয়ে গেছে কেবল চার মাযহাব। এজন্যই মাযহাব চারটি। তাছাড়া বিভিন্ন মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে যতো বড় বড় মনীষীর মাযহাব রয়েছে, একান্ত বিচ্ছিন্ন মত না হলে তার সবই চার মাযহাবের ইমামগণের কেউ না কেউ গ্রহণ করে নিয়েছেন। সুতরাং চার মাযহাবের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি করতে চাওয়া ভুল। তেমনি চার মাযাহাব ভেঙ্গে এক মাযহাব সৃষ্টির চেষ্টাও একটি অগভীর চিন্তার সাময়িক উন্মাদনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইচ্ছার বিপরীতে দিবাস্বপ্নমাত্র।

প্রচলিত মাযহাব ব্যক্তিবিশেষের মতের সমষ্টি নয়

চার মাযহাবের কোনোটাই নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির মতের সমষ্টির নাম নয়। বরং তার এলাকার পূর্ববর্তী সাহাবী ও ইমামগণের মতের সমষ্টি। এমনকি পরবর্তী আলেমগণও যাচাইবাছাই করে যখন আপন মাযহাবের মত দুর্বল মনে করেছেন, তখন অন্য মাযহাবের মতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন। এভাবে ঐ ফতোয়াটিই মাযহাবের অগ্রগণ্য মতের মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন হানাফী মাযহাবের অনেক মাসআলায় ইমাম আবু হানিফার মত অনুসারে ফতোয়া দেয়া হয় না, অন্য মত অনুসারে ফতোয়া দেয়া হয়।

সুতরাং একটি মাযহাবের অনুসরণ মানে এক ব্যক্তির অনুসরণ নয় (তাকলীদে শখসী নয়) বরং একটি ঘরানার বড় এক জামাতের

ব্যাক্ষার অনুসরণ, যেখানে সাহাবী-তাবেঈ সবাই আছেন। যদিও মনে করা হয় এটা তাকলীদে শখসী (এক ব্যক্তির অনুসরণ)।

ইতিহাসের গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম তাকলীদ করতে বারণ করেননি

তাকলীদ হলো এই উম্মতের ইজমাঈ (সর্বজনস্বীকৃত) মাসআলা। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকলীদ অস্বীকার করে, সে এই উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন মত লালন করে। সাহাবাযুগ থেকে যে জিনিস হালাল হিসাবে চলে আসছে, সেই হালালকে হারাম বলা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী! তাকলীদ বিষয়ে ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য এই একটি কথাই যথেষ্ট যে, উম্মতের গ্রহণযোগ্য সকল আলেম যে বিষয় হালাল হবার ব্যাপারে একমত, সেটি হারাম হতে পারে না। এমন বিষয় অস্বীকার করা বিকৃত-রুচির পরিচায়ক।

ভেবে দেখুন, ইমাম আওযাঈ (মৃত্যু:১৫৭হি.) ও ইমাম মালেক (মৃত্যু:১৭৯হি.)-এর জীবদ্দশাতেই তাদের মাযহাব সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। ইমাম বোখারীর বিশিষ্ট উস্তাদ, হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (মৃত্যু:২৩৩হি.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, তরজমায়ে ইমাম মালেক)

তার মানে! সেই কবে থেকে মাযহাব একটি সুপরিচিত বিষয় চিন্তা করা যায়! ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব কারো পছন্দ হলে ঐ বিষয়ে আপত্তি করা অন্যের জন্য বৈধ নয়। যার কাছে শাফেঈ মাযহাব ভালো লাগে, সে মালেকী মাযহাব পছন্দ করে এমন কারো প্রতি আপত্তি করতে পারবে না। তেমনি কারো কাছে হাম্বলী মাযহাব ভালো লাগলে সে শাফেঈ মাযহাব বা অন্য কোনো মাযহাবের অনুসারীর প্রতি আপত্তি রাখতে পারবে না।’ (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ২০/২৯২)

অন্য এক প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেন, 'মানুষের অবস্থা দুটি। হয় নিজে মুজতাহিদ হবে, নয়তো অন্য কারো তাকলীদ করবে। যদি কারো তাকলীদ করে, তবে প্রাথমিক যুগের কোনো ইমামের তাকলীদ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রাথমিক যুগ পরবর্তী যুগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' (প্রাগুক্ত ২০/৯)

অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মত হলো, যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নয়, তাকে তাকলীদ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী কালের যেমন তেমন কারো অনুসরণ না করে প্রাথমিক কালের কোনো ইমাম বিশেষত চার ইমামের কোনো একজনকে অনুসরণ করবে। কারণ একমাত্র চার ইমামের মাযহাবই তফসিলিভাবে সংরক্ষিত আছে এবং এর উপর যুগ যুগ ধরে আলেমগণের যাচাইবাছাই চলে আসছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর শাগরিদ ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর মতে তাকলীদ কারো জন্য জায়েয (অনুমোদিত) আর কারো জন্য ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়)। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তের অনুসরণে একনিষ্ঠ, কিন্তু কিছু মাসআলা সে নিজে নিজে বের করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার চে বড় কোনো আলেমের তাকলীদ করবে, এটা প্রশংসাযোগ্য, নিন্দাযোগ্য কোনো বিষয় নয়। সে বরং এর জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে, গোনাহগার হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'তাকলীদে ওয়াজিব' ও 'তাকলীদে জায়েয' এর অধীনে আসবে ইনশাআল্লাহ।' (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৮৮)

প্রখ্যাত সৌদি আলেম শায়খ সালেহ আল ফাউযান লিখেছেন, '...ভেবে দেখুন! মুহাদ্দিসগণের মাঝে এঁরা হলেন একেকজন বড় বড় ইমাম। এঁরা সবাই মাযহাব মানতেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু:৭২৮হি.) ও ইবনুল কাইয়্যিম (মৃত্যু:৭৫১হি.) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম নববী (মৃত্যু:৬৭৬হি.) ও ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু:৮৫২হি.) ছিলেন শাফেঈ

মাযহাবের অনুসারী। ইমাম তাহাবী (মৃত্যু:৩২১হি.) হলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম ইবনু আব্দিল বার (মৃত্যু:৪৬৩হি.) হলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। (ইআনাতুল মুস্তাফীদ ১/১২)

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী (মৃত্যু:১২০৬হি.) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ও তার অনুসারীগণ বলতেন, 'সাধারণ মানুষ চার ইমামের কোনো এক ইমামের মাযহাব মানতে বাধ্য বলে আমরা বিশ্বাস করি।' (আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ১/২৭৭)

মুহাদ্দিসগণের কর্মধারা ও মাযহাব

হিজরি চতুর্থ শতক থেকে যত আলেম মুহাদ্দিস এই উম্মতের মাঝে পয়দা হয়েছেন, তাদের সকলে সুনির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেউ শাফেঈ কেউ মালেকী, কেউ হানাফী কেউ হাম্বলী। কোরআন-হাদীসের অনুসরণে মাযহাব মানার পদ্ধতি সঠিক ও যথার্থ প্রমাণিত হবার জন্য এই এক দলিলই যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতির অনুসরণের মাঝে মানুষের দ্বীন ও ঈমান হেফাজতের রহস্য নিহিত। সুনির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা নিম্নরূপ:

১. ইমাম মুযানী (মৃত্যু:২৬৪হি.)

২. মুহাদ্দিস আবু বকর খাল্লাল (মৃত্যু:৩১১হি.)

৩. ইবনুল মুনযির (মৃত্যু:৩১৮হি.)

৪. ইমাম তাহাবী (মৃত্যু:৩২১হি.)

৫. মুহাদ্দিস রামাহুরমুযী (মৃত্যু:৩৬০হি.)

৬. ইমাম দারাকুতনী (মৃত্যু:৩৮৫হি.)

৭. ইমাম খাত্তাবী (মৃত্যু:৩৮৮হি.)

৮. মুহাদ্দিস আবু নুআইম (মৃত্যু:৪৩০হি.)

৯. ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু:৪৫৮হি.)

১০. ইমাম ইবনু আব্দিল বার (মৃত্যু:৪৬৩হি.)

১১. খতীব বাগদাদী (মৃত্যু:৪৬৩হি.)

১২. মুহাদ্দিস ইবনে মান্দাহ (মৃত্যু:৪৭৫হি.)

১৩. মুহাদ্দিস ইবনে মাকুলা (মৃত্যু:৪৭৫হি.)

১৪. ইমাম বাগাবী (মৃত্যু:৫১০হি.)

১৫. মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায (মৃত্যু:৫৪৪হি.)

১৬. মুহাদ্দিস ইবনে আসাকির (মৃত্যু:৫৭১হি.)

১৭. মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (মৃত্যু:৫৯৭হি.)

১৮. মুহাদ্দিস জিয়া আল মাকদিসী (মৃত্যু:৬৪৩হি.)

১৯. মুহাদ্দিস ইবনুল সালাহ (মৃত্যু:৬৪৩হি.)

২০. ইমাম মুনযিরী (মৃত্যু:৬৫৬হি.)

২১. ইমাম নববী (মৃত্যু:৬৭৬হি.)

২২. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু:৭২৮হি.)

২৩. ইমাম বিরযালী (মৃত্যু:৭৩৯হি.)

২৪. ইমাম ইবনু আব্দিল হাদী (মৃত্যু:৭৪৪হি.)

২৫. খতীব তাবরীযী (মৃত্যু:৭৪৮হি.)

২৬. ইমাম যাহাবী (মৃত্যু:৭৪৮হি.)

২৭. ইবনুল কাইয়্যিম (মৃত্যু:৭৫১হি.)

২৮. মুহাদ্দিস তকী উদ্দীন সুবকী (মৃত্যু:৭৫৬হি.)

২৭. ইমাম যাইলাঈ (মৃত্যু:৭৬২হি.)

২৯. মুহাদ্দিস তাজুদ্দীন সুবকী (মৃত্যু:৭৭১হি.)

৩০. মুহাদ্দিস ইবনে কাছীর (মৃত্যু:৭৭৪হি.)

৩১. মুহাদ্দিস ইবনে রজব (মৃত্যু:৭৯৫হি.)

৩২. ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী (মৃত্যু:৮০৬হি.)

৩৩. মুহাদ্দিস ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু:৮৫২হি.)

৩৪. মুহাদ্দিস সাখাবী (মৃত্যু:৯০২হি.)

৩৫. মুহাদ্দিস জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু:৯১১হি.)

৩৬. মুহাদ্দিস ইবনে হাজার হায়ছামী (মৃত্যু:৯৭৪হি.)

৩৭. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী (মৃত্যু:১২০৬হি.)

প্রমুখ এই উম্মাহর গর্বের ধন মুহাদ্দিসীনে কেরাম। এছাড়া আরও কতজনের নাম ইচ্ছা করলেই উল্লেখ করা যায়। যারা সকলে আপন আপন সময়ে হাদীসের ইমাম ছিলেন। এদের হাতেই হাদীস ও ফিকাহ-শাস্ত্র বিকাশ লাভ করেছে। আর এরা সকলে ছিলেন মাযহাবপন্থী। সুতরাং মুহাদ্দিসীনে কেরামের কর্মপন্থা হলো মাযহাব অনুসরণ, বিরোধিতা নয়। আর তাই আমাদের কালের আহলে হাদীস ভাইদেরও মাযহাব মেনেই চলা উচিৎ, বিরোধিতা করে নয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম ইনসাফ ও ভারসাম্যের সাথে চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব অনুসরণে বাধা দেননি। সুতরাং আজ যারা বাধা দিচ্ছে, তারা পূর্ববর্তী সকল আলেমের বিরুদ্ধাচারী। ইবনে কাছীর, যাহাবী, ইবনে রজব, ইবনু আব্দিল হাদী এমনকি ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম এবং শেষ যামানার মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদীসহ সর্বস্তরের আলেমের কর্মপন্থাত্যাগী। তবে কি বলতে চান, এরা কেউ দ্বীন বুঝেননি এবং এমন জিনিসকে তারা জায়েয মনে করেছেন, যা হারাম এবং শিরক! সুতরাং পূর্ববর্তী সকল আলেম ও সাধারণ মুসলমান মুশরিক! সুবহানাল্লাহ! এর চে জঘন্য

খারেজী (বিদ্রোহী) মনোবৃত্তি আর কী হতে পারে! আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী ও তাঁর অনুসারীগণ

বর্তমানে যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বা সালাফী নামে পরিচয় দেয় এবং মাযহাব মানার বিরোধিতা করে তারা ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী প্রমুখের নাম সবচে' বেশি উচ্চারণ করে থাকে। ইতিপূর্বে মাযহাব প্রসঙ্গে এই তিনও ইমামের মত আমরা উল্লেখ করেছি এবং আমরা দেখেছি, তারা সবাই মাযহাবপন্থী ছিলেন, শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর সন্তান ও জানশীন (স্থলাভিষিক্ত) একজন আলেম লিখেছেন, 'আমরা ফিকহী মাসআলায় হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। চার ইমামের কোনো এক ইমামের অনুসারী কারো প্রতি আমরা কটুক্তি করি না এবং আমরা এর বাইরের কোনো মাযহাবও অনুসরণ করতে দিই না। কারণ ওগুলো সংরক্ষিত নেই। আর রাফেজী যায়দী (শিয়া) ইত্যাদি মাযহাবও ভ্রান্ত। এজন্য এগুলোর উপর আমরা কাউকে থাকতে দিই না। বরং আমরা সকলকে চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করতে বাধ্য করি। (আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ১/১৭৭)

প্রশ্ন হলো, যারা তাকলীদকে হারাম শিরক ইত্যাদি বলতে দ্বিধা করেন না, তারা কি এই কথা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী, ইবনে উছাইমীন, সালেহ আল ফাউযান সম্পর্কেও বলতে পারবেন? উম্মতের সকল আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিসের বিরুদ্ধে শিরকের অভিযোগ দায়ের করবেন?

হ্যাঁ, উম্মতের সকল আলেমই তাকলীদ করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা বজায় রাখার তাকিদ করেছেন, বাড়াবাড়ি অপছন্দ করেছেন। কিন্তু তাকলীদ পরিত্যাগের মতো অবাস্তব আহ্বান কেউ জানাননি। অনেক খুঁজলে হাজার বছরের ইতিহাসে হাতে গণা দুই/চারজন

পাওয়া যাবে যারা বিশেষ কোনো মাযহাব অনুসরণ করতেন না। তাদের কর্মপন্থা হাজারো আলেমের মতের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং সাধারণ মানুষকে তাকলীদ পরিত্যাগের দাওয়াত দেওয়া একটি নতুন অবাঞ্ছিত কাজ, পূর্বকালে যার নজির নেই।

আহলে হাদীস ভায়েরাও তাকলীদ করে!

যার ভিতর বিন্দু পরিমাণ ইনসাফ আছে, সেও স্বীকার করবে, আহলে হাদীস আলেমরা তাদের জনসাধারণকে দিয়ে নিজেদের তাকলীদ করায়! মাযহাব তারাও মানে। তাদের নিজেদের মাযহাব হলো আহলে হাদীস মাযহাব বা সালাফী মাযহাব। যার মূল কথা হলো, 'নিজেদের বুঝ মতো কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা। অন্য মত যত শ্বাশতই হোক তাকে ভুল মনে করা এবং সহ্য না করা।' যাইহোক, আসলে আহলে হাদীসগণও মাযহাব মানতে বাধ্য। কারণ কোরআন-হাদীস থেকে একজন নিরক্ষর পানবিক্রেতা (লা-মাযহাবী) আহলে হাদীস/সালাফী, কিংবা সাধারণ শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি প্রতিদিনের অসংখ্য দ্বীনী মাসআলার একটিও তো নিজে নিজে বের করতে সক্ষম নয়। তবে সে আমল করে কিভাবে? একাধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হাদীস যাচাই এবং ইমামগণের মতসমূহ থেকে অগ্রগণ্য মত বাছাই করার সামর্থ্য কি তার আছে? হাদীসের সূত্র সহীহ না যঈফ তা নির্ধরণ করার কি তার পক্ষে সম্ভব? তাহলে সে কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করে কিভাবে? অর্থাৎ সে তার পছন্দের কোনো সালাফী/আহলে হাদীস আলেমের কথা মতো আমল করে। ঐ মাওলানা হয়তো দয়া করে একটি দলিল বা তার তরজমা বলে দেন। কিন্তু লোকটি নিজে দলিল বুঝে না, কোন মাসআলার জন্য কী ধরনের দলিল প্রয়োজন, কোন কিতাব উদ্ধৃতির উপযুক্ত আর কোন কিতাব উদ্ধৃতি হিসাবে যথেষ্ট নয় কিছুই সে জানে না, তরজমাটা সঠিক কি না তাও বুঝে না! বলুন তাহলে, মাযহাব না মানার কী অর্থ? তাকলীদকে শিরক বলার মানে কী?

চিন্তা করুন পাঠক! পূর্বেকার মহান ইমামগণের সিদ্ধান্ত যা হাজার বছর যাবৎ লাখো আলেম-উলামার যাচাই বাছাইয়ে উত্তীর্ণ, ঈমান-আমল রক্ষার জন্য তাঁদের অনুসরণ নিরাপদ না কি এই যামানার স্বীকৃতিহীন লোকদের কথা শোনা নিরাপদ?

নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের একটি রহস্য

সাধারণ মানুষকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার জন্য এক অঞ্চলে এক মাযহাব মতো আমল করা একান্ত কাম্য। দ্বিতীয় কোনো মত সেখানে প্রকাশ না করা একান্ত কর্তব্য। কারণ মানুষ একটি আমলে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর নতুন আমল দেখলে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তো সাধারণ মানুষের মাঝে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার বড় প্রয়োজন সামনে রেখে ভুল না হওয়ার পরও ভিন্ন মাযহাবের মত প্রকাশ ও প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। একারণেই উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. মদিনায় আসলে তথাকার প্রচলিত মাযহাব অনুসারে বিচার করতেন। আবার সিরিয়া গেলে সেখানকার মতানুসারে ফায়সালা করতেন। কিন্তু এক এলাকার মাযহাব অন্য এলাকার লোকদের উপর চাপিয়ে দিতেন না। বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য একটি সাধারণ কাম্য বিষয়ও মুলতবি করে রাখা জরুরি। এখানে সে পসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। কুরাইশরা নির্মাণ-সামগ্রীর অপ্রতুলতার কারণে কাবা শরীফকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নকশা থেকে ছোট করে পুনঃনির্মাণ করেছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আয়শা সিদ্দীকা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, ‘আমার ইচ্ছে হয় কাবা শরীফকে ইবরাহীম আ.-এর নকশা মতো পুনঃনির্মাণ করি। কিন্তু কুরাইশ নওমুসলিমরা বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে বলে আমি তা করছি না।’ (সহীহ বোখারী, ১২৬) এ থেকে বোঝা গেলো, মুসলিম মিল্লাতের

বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে একটি সাধারণ উত্তম কাজও স্থগিত রাখা জরুরি।

মাযহাব মানার শক্তিশালী দলিল

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম ইনসাফ ও ভারসাম্যের সাথে চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব অনুসরণে বাধা দেননি। সুতরাং আজ যারা বাধা দিচ্ছে, তারা পূর্ববর্তী সকল আলেমের বিরুদ্ধাচারী। ইবনে কাছীর, যাহাবী, ইবনে রজব, ইবনু আব্দিল হাদী এমনকি ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম এবং শেষ যামানার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী সহ সর্বস্তরের আলেমের কর্মপন্থাত্যাগী। তবে কি বলতে চান, এরা কেউ দ্বীন বুঝেননি এবং এমন জিনিসকে তারা জায়েয মনে করেছেন, যা হারাম এবং শিরক! সুতরাং পূর্ববর্তী সকল আলেম ও সাধারণ মুসলমান মুশরিক! সুবহানাল্লাহ! এর চেয়ে জঘন্য খারেজী মনোবৃত্তি আর কি হতে পারে! আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন ।

নির্দিষ্ট মাযহাব মানা জরুরি

সাধারণ মানুষকে যদি একটি পরীক্ষিত সুনির্দিষ্ট ব্যাক্ষানীতির অনুসারী আলেমের পরামর্শ ত্যাগ করে যখন যে মাযহাব ও ঘরানার আলেমকে ইচ্ছা মাসআলা জিজ্ঞেস করে আমল করতে উৎসাহিত করা হয়, তবে নির্ঘাত গণমানুষের ঈমান-আমল এলোমেলো হয়ে যাবে, তাদের শান্ত-সমাহিত ধর্মীয় জীবন দুশ্চিন্তায় ছেয়ে যাবে, অস্থিরতায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এমনকি অযোগ্য লোকের খপ্পরে পড়ে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্য যখন যে মাযহাবের আলেমকে ইচ্ছা মাসআলা জিজ্ঞেস করা সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়; বরং সুনির্দিষ্ট একটি মাযহাব অনুসরণ করা এবং ঐ মাযহাবের অনুসারী আলেমগলের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা মঙ্গলজনক এবং শৃঙ্খলাগত প্রয়োজনে

ওয়াজিব। (কারণ দ্বীনের প্রত্যেক আদিষ্ট বিষয়ের পরিপালন যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, সে বিষয়টি সরাসরি আদিষ্ট না হলেও আদিষ্ট বলে গণ্য হয়। শরীয়তের পরিভাষায় যাকে 'ওয়াজিব লি গাইরিহী' বলে। ইসলামী শরীয়তে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন আরবি ব্যাকরণ সাহাবায়ে কেরামের স্বভাবগত ছিলো। ফলে শরীয়া-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য আলাদাভাবে আরবি ব্যাকরণ-শাস্ত্র পড়া তাঁদের উপর ওয়াজিব ছিলো না। কিন্তু আমাদের উপর শরীয়া-বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার জন্য আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ জানা ওয়াজিব যাকে বলে 'ওয়াজিব লি গাইরিহী'! তেমনি কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি মাযহাব ও ব্যাক্ষানীতি অনুসরণ করাও 'ওয়াজিব লি গাইরিহী'। যাতে মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচতে পারে এবং সুশৃঙ্খল থাকতে পারে।)

সাধারণ মানুষের জন্য স্থানীয় আলেমগণের তাকলীদ করা আবশ্যক

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর অনুসারী, সৌদি আরবের সর্বজনমান্য আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন অনেকবার বলেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য আপন অঞ্চলের আলেমদের মাযহাবই মানা উচিৎ। কেউ যদি বলে, যখন যে ধারার আলেমকে ভালো লাগবে তার অনুসরণ করবো, এতে দোষের কী আছে? শায়েখ বলেন, 'না, আপনার জন্য এমনটা করার সুযোগ নেই। কারণ আপনার উপর জরুরি কেবল তাকলীদ করা। আপনার পক্ষ হতে তাকলীদের অধিক হকদার হচ্ছেন আপনার এলাকার আলেমগণ। আপনি যদি আপন এলাকার অধিকাংশ আলেমদের ছেড়ে অপর আলেমদের তাকলীদ করেন, তাহলে ফেতনা সৃষ্টি হবে। অথচ (আপন আলেমদের ছেড়ে) অপর আলেমদের অনুসরণে আপনার কাছে কোনো শরঈ দলিল নেই। (সুতরাং যে বিষয়ে শরঈ দলিল নেই, উপরন্তু তা ফেতনা সৃষ্টিরও কারণ, এমন কাজ কি শুধু আপনার ভালো লাগা না লাগার ভিত্তিতে

অনুমোদিত হতে পারে? (প্রিয় পাঠক একটু ভেবে দেখুন!) এজন্যই সাধারণ মানুষের উপর আপন এলাকার নির্ভরযোগ্য আলেমগণের তাকলীদ করা জরুরি। আমাদের শায়খ আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে সা'দীও এ-মতের জোর সমর্থক। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকার আলেমদের অনুসরণ করার অনুমতি নেই। কারণ এতে করে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের এলাকার কেউ যদি উটের গোশত খেয়ে বলে যে, আমি ইরাকের সুন্নাহসম্মত মাযহাব অনুসারে অযু করবো না, (অথচ তার এলাকার আলেমদের হাদীস-সম্মত মাযহাব অনুযায়ী উটের গোশত খেলে অজু করা আবশ্যক) তাহলে আমরা তাকে বলবো, এমনটা করার সুযোগ নেই। তোমার উপর অযু ওয়াজিব। কারণ তোমার এলাকার হাম্বলী মাযহাব অনুসারী আলেমদের হাদীস-সম্মত মত এটাই। আর তুমি তো তোমার এলাকার আলেমদের অনুসারী!' (লিকাআ-তুল বাবিল মাফতূহ ৩২/১৯)

প্রিয় পাঠক! উপরের উদ্ধৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। মাযহাব বিরোধী ভায়েরা ভেবে দেখুন, আপনারা তো এতদঅঞ্চলের আলেমদের গোঁড়া, মাযহাবের অন্ধ অনুসারী কূপমুণ্ডক, এমনকি মুশরিক বলতেও লজ্জাবোধ করেন না। আপনারা আরবের এই সমস্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমগণের পরামর্শগুলো চিন্তা করুন। যেখানে হানাফী মাযহাব সমাদৃত, সেখানকার মানুষকে আরবের আলেমদের অনুসরণ করতে বলা এবং মাযহাব বিরোধী আলেমদের কথা মানতে দাওয়াত দেয়া কতটা অপরিণামদর্শিতা তা একটু ভেবে দেখুন।

আমাদের দেশে তো মসজিদে মসজিদে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। একে অপরকে গালিগালাজ করতেও ছাড়া হচ্ছে না। হিংসা-বিদ্বেষের বিষ-বাষ্প পরিবেশকে চূড়ান্তরূপে বিষাক্ত করে ফেলছে। পারস্পরিক মিল-মোহাব্বত যেন চিরতরে বিদায় হয়ে যাচ্ছে। শায়খ

উছাইমীন (মৃত্যু:১৪২১হি.) রহ. আমাদের দেশের দুর্দশা দেখেননি। যদি তিনি দেখতেন তবে না জানি কী বলতেন!

আহলে-হাদীস ভাইদের আচরণ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

তাওসীফুর রহমান গালিব নামের একজন হিন্দুস্তানী 'লা-মাযহাবী' (মাযহাব-বিরোধী/কোরআন-হাদীস অনুসরণের সুনির্দিষ্ট পথহীন) এক ভাই মাযহাবপন্থী আলেমগণের ব্যাপারে লিখেছেন, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোকাবেলায় যারা পীর-ফকীর ও ইমামদের অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানায়, তাদের পিছনে নামায পড়া হারাম। আহলুস সুন্নাহর (?) ইমামগণ এদেরকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী-কাফের) আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব বলেছেন।'

প্রিয় পাঠক! এবার তবে চিন্তা করুন, উম্মতের অধিকাংশ মানুষকে কাফের বলা হলো খারেজীদের স্বভাব। যারা হযরত আলী ও মুআবিয়াসহ প্রায় সকল সাহাবীকে কাফের বলত। আবার তারা নিষ্ঠবান ইবাদতগুজারও ছিলো! কিন্তু এই উম্মতের সর্বসম্মত মত অনুসারে তারা ছিল গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। আমাদের কালের নামধারী আহলে হাদীস ভায়েরা কি তবে সেই খারেজীদের পথে হাঁটছেন! এতটা পক্ষপাতদুষ্ট উগ্র-অন্ধ-ঘৃণ্য মানসিকতা কী করে এই ভাইদের ভেতর জন্ম নিতে পারলো তা আমাদের বুঝে আসে না। উম্মতের অধিকাংশ মুসলমানকে যারা কাফের মনে করে, এমনকি এই উম্মতকে হত্যা করে ফেলার জঘন্য মনোবৃত্তি যারা লালন করে, তাদের কাছে ইসলাম ও মুসলমানের কোন কল্যাণটা আশা করা যায়?

আরবে এই জাতীয় লোকজনকে 'জামাতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ' (সকলকে কাফের আখ্যায়িতকারী এবং সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী দল) বলা হয়। এরা সমস্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে হত্যা, যুদ্ধ ও সন্ত্রাস চালানোকে বৈধ মনে করে। চরম বিদ্বেষপূর্ণ

উস্কানিমূলক বই-পুস্তক ও লিফলেট ব্যাপকভাবে প্রচার করে। নিজেদের অপরিণত-অমার্জিত বক্তব্যও ইন্টার্নেটে ছেড়ে দেয়। আল্লাহ পাক সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

আহলে-হাদীস ফেতনার বড় ক্ষতি

আমরা সবাই জানি, আজ পশ্চিমা সংস্কৃতির ঈমান-বিধ্বংসী সয়লাব চলছে চারদিকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভেসে যাচ্ছে এই সয়লাবে। এখনকার মূল কাজ ছিলো সর্বসম্মত বিষয়ে দাওয়াত দেওয়া। ঈমানী যিন্দেগী ও আখেরাত-মুখী জীবন গঠনে তৎপর হওয়া। কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের মাযহাব-বিরোধী অবস্থান এবং বিতর্কিত মাসলা বর্ণনার আড়ালে উলামা-বিরোধী অপপ্রচারের কারণে সাধারণ মানুষ অতীত-বর্তমানের সমস্ত আলেমের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ছে, এমনকি আলেমদের প্রতি কু-ধারণা ও বিদ্বেষ পোষণও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ফলে দ্বীনের মৌলিক তালীম ও তাবলীগ, মানুষের ঈমান-ইসলাম গঠন এবং ইবাদত ও তাকওয়ার পথে আহ্বান ও মতৈক্যপূর্ণ কাজের দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। মুসলমাসদের মধ্যকার সার্বজনীন ঐক্য এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বও ভেঙ্গ টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে।

আফসোস! আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, হারাম থেকে বাঁচা, শরীয়তের পাবন্দী করা, দোয়া-যিকির ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি মনোযোগী হওয়ার দাওয়াত এখন গুরুত্বহীন। লা-মাযহাবী ভায়েরা যদি দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে গুরুত্তারোপ করতেন, তাহলে নিজেদের তৎপরতার ক্ষতিটা ধরতে পারতেন।

একটি দরদী আহ্বান

আহলে হাদীস ভাইদের খেদমতে পূর্ণ দরদমন্দীর সাথে আরজ করছি, মাযহাব মানা, তাকলীদ করা ইত্তেবা করা একই মর্মের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। আপনারা সরাসরি কোরআন-হাদীসের ইত্তেবার নামে দ্বীনের এমন একটি বিষয় অস্বীকার করছেন এবং তা নিয়ে এত

বেশি মাতামাতি করছেন, যা ইতিপূর্বের গ্রহণযোগ্য কোনো কেউ করেননি। ইসলামের ইতিহাসে একদম নতুন পূর্বভিত্তিহীন একটি দাবী নিয়ে এভাবে ধর্মীয় অঙ্গনে অরাজকতা সৃষ্টি করার দ্বারা দ্বীনের কোন মঙ্গলটা হবে একটু ভেবে দেখুন।

আপনারা জানেন, দ্বীনের যে বিষয়টি স্বাভাবিক কারণেই হালাল, সেটিকে ভুল ব্যাখ্যা করে হারাম আখ্যায়িত করা মারাত্মক গুনাহ ও পাপ। আল্লাহর ওয়াস্তে উম্মতের প্রায় সকল আলেম যে বিষয়টিকে হালাল বলেছেন, আপনার সেটাকে হারাম বলা থেকে বিরত থাকুন।

দলকানা হওয়া এবং পার্টি-সাম্প্রদায়িকতা কঠিনতম ব্যধির অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনের কল্যাণ হোক বা না হোক নিজ গ্রুপের স্বর্থ-রক্ষা হতেই হবে এমন মনোবৃত্তি জঘন্য পাপ ও অপরাধ। আজ ইনসাফ ও বিবেকের সব দাবীই দলাদলির দেয়ালে মাথা ঠুকরে ফিরে আসছে। ইসলাম ও মুসলমানের সামনে এই মুহূর্তে সবচে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি, তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, শয়তানি সংস্কৃতির সয়লাব কিভাবে ঠেকানো যাবে, মানুষের মাঝ থেকে বস্তুবাদ, দুনিয়ামুখিতা, ধোকা-প্রতারণা ইত্যাদি কিভাবে দূর করা যাবে, তা নিয়ে কাজ করা এখন সময়ের দাবি। রাজনৈতিক হেনস্থা থেকে মুক্তি, নাস্তিক্যবাদ থেকে মানুষের ঈমান হেফাজত এবং ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু আমরা শাখাগত ‘উত্তম’ আর ‘অধিক উত্তম’ নিয়ে আত্মহননের আয়োজন করে যাচ্ছি। আসুন আমরা এ-থেকে বিরত হই। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট:

সাধারণ মুসলিম ভাই ও বোনের প্রতি আহ্বান

১. আপনার কাছে কেউ উলামা-মাশায়েখের আমলের বিপরীত কোনো নতুন দাওয়াত নিয়ে এলে বলুন, আমরা সাধারণ মানুষ, সরাসরি কোরআন-হাদীস কিংবা তার অনুবাদ যাচাই করে ঠিক-

বেঠিক নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব কঠিন। আপনাদের নতুন দাওয়াত মানতে হলে আপনাদের উপর নির্ভর করেই মানতে হবে, তাহলে উলামা-মাশায়েখের উপর নির্ভর করে কোরআন-সুন্নাহ মানতে সমস্যা কোথায়?

২. নতুন পথে আহ্বানকারীদেরকে হেকমতের সাথে কোনো প্রাজ্ঞ আলেমের কাছে নিয়ে আসুন। তাকে বলুন, বহুকাল থেকে আমরা কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণে যাদের ব্যাখ্যা মেনে আসছি, তাদের কাছে আপনি আপনার মত প্রমাণ করুন, আমরা আপনার ব্যাখ্যা মেনে নিবো।

৩. একটি মোটা কথা চিন্তা করুন, হাদীসের সংকলন-গবেষণা ও পঠন-পাঠনে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই হাদীস-বিরোধী বলে অভিযুক্ত হবেন? হাজার বছর ধরে বড় বড় ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, আলেম অলী-বুযুর্গ যাদের সম্পর্কে নবীজী বলেছেন, 'নিশ্চই আলেমরা নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ মিরাছ হিসাবে দীনার-দিরহাম রেখে যান না, তাঁরা রেখে যান দ্বীনের ইলম। সুতরাং যারা সেই ইলম হাসিল করলো তারা বিরাট হিস্যা অধিকার করলো।' (তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮২) সেই আলেমগণের অধিকাংশজন নামাযের মতো সর্বজনবিদিত ইবাদতে (লা-মাযহাবী ভাইদের অভিযোগ মতে) দৈনিক পাঁচ বার নবীজীর সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছেন, এটা কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা হলো? যাদের আল্লাহ-ভীতি, সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসা এবং দ্বীনের প্রতি কল্যাণকামিতা প্রশ্নাতীত, তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কি বিবেকসম্মত?!

৪. আগের ও সমকালের জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেম থেকে বিচ্ছিন্নতা ও তাঁদের প্রতি অনাস্থা সকল গোমরাহির মূল। এজন্য সাধারণ মানুষকে আলেমগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাঁদের প্রতি আস্থাহীন করে তোলা সকল দুশমন ও বাতিলপন্থীর প্রথম টার্গেট। সুতরাং যারা বিকৃতভাবে মতভেদপূর্ণ মাসআলা প্রচার করে বেড়ায়,

আলেমগণকে যারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ওয়ারিশে নবীদের চেও যারা নিজেদেরকে অধিক দ্বীনদরদী মনে করে এবং যারা আলেমদের চেও বেশী দ্বীন বুঝার দাবি করে তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

৫. হেদায়েত লাভের আশা নিয়ে কোনো যোগ্য আলেমের তত্ত্বাবধানে কোরআন-হাদীস পড়–ন। সাধারণ ভাইদের পক্ষে গবেষণা করা বা ফতোয়া দানের উদ্দেশ্য নিয়ে অনুবাদ পড়া অনধিকার চর্চার শামিল, এ থেকে বিরত থাকুন।

৬. আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা তো একটি অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করতেও অক্ষম। সুতরাং আমাদের জন্য কারো অনুবাদ পড়ে হঠাৎ করেই এযাবৎ কালের সকল আলেম-উলামার কর্মপন্থা ত্যাগ করে নতুন কর্মপন্থা অনুসরণে লেগে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। আমরা এমন নির্বুদ্ধিতা থেকে অবশ্যই নিজেদের রক্ষা করবো।

৭. এখন প্রচার-যন্ত্র সহজলভ্য হওয়ার কারণে সঠিক জিনিসের প্রচার যেমন সহজ হয়েছে তেমনি ভুল জিনিসের প্রচারও তুঙ্গে উঠেছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার সুযোগ না থাকায় সম্পূর্ণ একটি ভিত্তিহীন আজগুবি জিনিসেরও এখন ভক্তের অভাব হয় না। দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচার-মাধ্যম এবং ইনসাফ-বঞ্চিত লোকজনের চটকদার উপস্থাপনে আজ সাধারণ মানুষ দিশেহারা কিংবা মাতোওয়ারা। ফলে তাদের জন্য ভালো-মন্দের তমিজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই নিজের দ্বীন-ঈমান হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন।

৮. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ইলম অর্জন করো তা বিদায় নেয়ার আগে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইলম কিভাবে বিদায় নেবে হে আল্লাহর নবী! আমাদের মাঝে তো আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় নবীজী রুষ্ট

হলেন অতঃপর বললেন, তোমাদের মরণ হোক! বনি ইসরাইলের মাঝে কি তাওরাত-ইঞ্জিল ছিল না? কিন্তু (ইলম অর্জন ও দীন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) শুধু কিতাব তাদের কোন কাজে আসেনি। আরে! ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ (আহলে ইলম থেকে ইলম শিখে নেয়ার আগেই) আহলে ইলমের মৃত্যু হওয়া, ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ আলেমে দ্বীনের বিদায় নেওয়া! সুনানে দারেমী, ২৪৬

নবীজীর এই নির্দেশ মোতাবেক সাহাবায়ে কেরামের মৃত্যুর আগে আগে তাঁদের কাছ থেকে তাবেঈগণ ইলম শিখে নিয়েছেন। এঁদের কাছ থেকে দ্বীন শিখে নিয়েছেন তাবে-তাবেঈনে কেরাম। তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেন এঁদের পরবর্তীরা। এভাবে প্রজন্মপরম্পরায় কোরআন-হাদীস শেখার ধারা প্রবর্তন করে নবীজী কোরআন-সুন্নাহ হেফাজতের সবচে শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং দ্বীন ও শরীয়তের অনুসারী সমঝদার মানুষের নিকট কোনো ভুঁইফোড় ব্যক্তি (খৃস্টধর্ম বিনাশী সেন্ট পলের মতো কেউ) নিজেকে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, এমন ব্যক্তির কাছ থেকে কখনোই দ্বীন গ্রহণ করা হয় না। যিনি অধিকাংশ আলেম-ওলামার আস্থাভাজন নন, যার দ্বীনী ইলম অর্জনের উৎস আমাদের নিকট অজ্ঞাত, ইলম-আমলে যার উস্তাদগণের উর্ধ্বক্রম (সনদ-সূত্র) স্বীকৃত নয়, তার কাছ থেকে ইলম অর্জন করা নিরাপদ নয়। হতে পারে ইনি কোনো গোপন শত্রুর হাতে রিক্রুট হয়ে আছেন!

এজন্য আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, এমন একজন আলেমকে নিজের পরামর্শকরূপে গ্রহণ করা, যিনি ইলম ও আমলে আদর্শস্থানীয় উস্তাদের দীর্ঘ সান্নিধ্য পেয়েছেন, যিনি কোরআন-সুন্নাহর প্রতিষ্ঠিত অর্থ এবং উম্মতের ঐকমত্যের ব্যতিক্রম করেন না, যার কথাবার্তা একপেশে-অমার্জিত এবং সহিংস নয়, যিনি শরীয়তের ছোট ছোট বিষয়ও নিজের জীবনে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ

করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

আহলে হাদীস ভাইদের প্রতি আহ্বান

১. পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়াঝাটি সর্বসম্মতভাবে হারাম, আমরা এ থেকে বিরত হই। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও কল্যাণকামিতার মানসিকতা নিয়ে আসুন আমরা (আলেমরা) ইলমী আলোচনায় অংশ নিই। আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি, উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মতপার্থক্য মন্দ কিছু নয়, এটা হতেই পারে। খারাপ হলো অযোগ্য লোকের হস্তক্ষেপ, কোরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকদের মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়ের একপেশে প্রচারণা, পরিণামে ঝগড়াঝাটি। আসুন আমরা এ-থেকে বিরত হই।

২. আহলে হাদীস ভাইদের প্রতি পরামর্শ থাকবে, আমরা এক তরফা, খণ্ডিত ও অপূর্ণাঙ্গ পড়াশোনা পরিহার করি। নিজেদের বই-পুস্তকের পাশাপাশি মুক্ত মনে অপর মতের কিতাবাদিও অধ্যয়ন করি, ইনশাআল্লাহ চোখ খুলে যাবে।

৩. বেনামাযীদের নামাযী বানানোর চেষ্টায় অংশ নিই। মিশনারি ফেতনা ও কাদিয়ানি অপতৎপরতা প্রতিরোধে উদ্যোগী হই। পশ্চিমা সংস্কৃতির মোকাবেলা ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। স্মরণ রাখি যে, মাযহাব মানে দলাদলি নয়; এটা সুন্নাহর বিভিন্নতা ও বৈচিত্র। দলাদলি হয় এক সুন্নাহ বাতিল করে আরেক সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দিতেগেলে এবং বিদ্বেষ ছড়ালে।

৪. বিদআতের মোকাবেলায় সুন্নাহর আহ্বান হয়, একটি সুন্নাহ ত্যাগের জন্য আরেকটি সুন্নাহর আহ্বান সাহাবায়ে কেরামের নীতির সম্পূর্ণ খেলাফ। কারণ তা এক সুন্নাহ দ্বারা অপর সুন্নাহ বাতিল করার নামান্তর। এজন্য দ্বীনের অকাট্ট, মৌলিক ও সর্বসম্মত বিষয়গুলোই কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াতের বিষয়।

দলিলসম্মত মতপার্থক্য দাওয়াতের বিষয়বস্তু নয়। সুতরাং দলিলসম্মত মতপার্থক্যকে দাওয়াতের বিষয়বস্তু বানিয়ে প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টি করা সুন্নাহ-বিরোধী কাজ। আসুন আমরা এ থেকে বিরত হই।

৫. হাদীসে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা যেমন আছে না করার কথাও আছে, উভয় দিকে সাহাবীগণের আমল আছে। সুতরাং একটির প্রতি বিরাগভাজন হয়ে অন্যটি গ্রহণ করা বা তার প্রতি দাওয়াত দেওয়া, অন্যটির অনুসারীদের বিরক্ত করা চরম অন্যায়-অদ্ভুত কাজ। এমন কাজ পরিহার করি।

মসজিদের ইমাম ও খতিবগণের প্রতি বিনীত আরজ

মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ প্রত্যেক এলাকার দ্বীনী যিম্মাদার। ইতিবাচক কাজের পাশাপাশি হেকমতের সাথে সকল ফেতনার মোকাবেলা করাও তাদের বড় দায়িত্ব। এর জন্য কিছু প্রস্তুতি নেয়া আবশ্যক। যেমন,

১. মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলার দলিল ভালোভাবে বুঝে নেওয়া এবং যেহেনে হাজির রাখা। সাধারণ মুসল্লিদের সামনে তা সহজ ও বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা।

২. দলিলসমৃদ্ধ নির্ভযোগ্য পুস্তিকা মুসল্লিদের হাতে হাতে পৌঁছে দেয়া।

৩. পূর্বের যামানায় 'আহলে হাদীস' মানে ছিলো হাদীস-বিশারদ মুহাদ্দিস, যারা সদাসর্বদা হাদীসের চর্চা-গবেষণায় ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরা ইজমা এবং কিয়াসকেও শরীয়তের দলিল গণ্য করতেন। কিন্তু বর্তমানে হাদীস চর্চা করুক বা না করুক, যে ব্যক্তি মাযহাবের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের মন মতো হাদীস মানে, ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করে, বিভিন্ন মাসআলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ (কোরআন-সুন্নাহ ও জামাআতে সাহাবার সমন্বিত মত ও

পথের অনুসারীগণ)-এর আকিদা-আমলের বিরোধিতা করে সে-ই আহলে হাদীস!

৪. হাদীস শরীফে ‘উগলূতাত’ করতে (উল্টাপাল্টা অবান্তর প্রশ্ন করে কাউকে পেরেশানিতে ফেলে দিতে) নিষেধ করা হয়েছে। আহলে হাদীস ভায়েরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীদেরকে ‘উগলূতাত’-এর মাধ্যমে পেরেশান করে থাকে। আপনি তাদের ‘উগলূতাত’ সম্পর্কে সজাগ থাকুন। যেমন তারা প্রশ্ন করে, নবীযুগে কি চার মাযহাব হানাফী মালেকী ইত্যাদি ছিলো? আপনি বলুন, সিহাহ সিত্তাহ সহীহ বোখারী সহীহ মুসলিম ইত্যাদি কি নবীযুগে ছিলো? আসলে হাদীস তো নবীযুগেরই, সংকলকের নাম হিসাবে বলা হয় সহীহ বোখারী সহীহ মুসলিম ইত্যাদি। ঠিক তেমনি মাযহাব ও ফিকহ নবীযুগ থেকে ছিলো। তবে সংকলনের হিসাবে বলা হয় হানাফী মালেকী ইত্যাদি।

কখনো তারা প্রশ্ন করে ফিকহ মানেন না কি হাদীস মানেন? আপনি বলুন, ফিকহ মানা এবং হাদীস মানা একই কথা। কারণ ফিকহ তো হাদীসে বর্ণিত মাসআলারই সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত সংকলন! আর ফিকহ মানাই হাদীস মানার সরল পথ।

অনেক সময় প্রশ্ন করে, আপনি মুসলমান না হানাফী! আপনি বলুন, আপনি ফরিদপুরী না বাংলাদেশী? অর্থাৎ যে ফরিদপুরী সে অবশ্যই বাংলাদেশী। দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তেমনি যিনি হানাফী তিনি অবশ্যই মুসলমান। এদুয়ের মধ্যেও কোনো বিরোধ নেই। যাইহোক তাদের এজাতীয় ‘উগলূতাত’-এর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

৫. আপনি স্মরণ রাখুন, নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই উম্মতের জমহুর আলেম-উলামা ও তাঁদের অনুসারীগণ কখনো বাতিল বিষয়ের উপর এক মত হবে না। (মুসনাদে আহমদ ২৭২২৪) বরং কেয়ামত পর্যন্ত সব যুগে ধরাবাহিকভাবে তাঁদের হকের উপর

GET IT ON Google Play
www.islamijindegi.com
Download on the App Store

বিদ্যমান হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত থাকবে। (সহীহ বোখারী ৭৩১১) লা-মাযহাবী মতবাদের অতীত ধারাবাহিকতা যেমন নেই তেমনি তাদের সঙ্গে আগের ও সমকালের অধিকাংশ স্বীকৃত আলেম-উলামার সমর্থনও নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন